পথের সন্ধান

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আর্য্য সাহিত্য ভবন
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা
১৩৩৫

প্রকাশক—
শ্রীরামেশ্বর দে

প্রথম সংস্করণ
পৌষ, ১৩৩৫
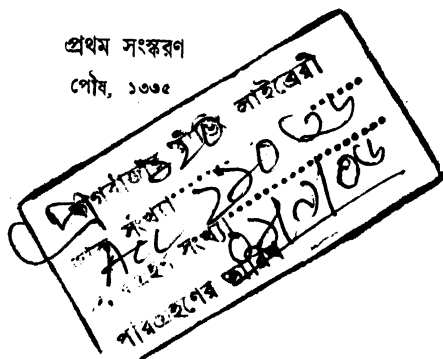
দাম পাঁচ সিকা

মুদ্রাকর—শ্রীশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
বাণী প্রেস
৩৩।এ মদন মিত্র লেন, কলিকাতা

বিষয় সূচী

পথের সন্ধান

গোড়ার অভাব

আমরা যে পরাধীন সে দোষ কার? ইংরেজের ঘাড়ে ষোল আনা দোষ চাপিয়ে দিতে পারলে আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে গালাগাল দিতে পারি বটে, কিন্তু মন তাতে প্রবোধ মানে না। যখন দেখতে পাই যে, ইংরেজ এদেশে আসবার আগে থাকতেই আমরা স্বাধীনতা হারিয়ে বসে' আছি, ইংরেজের আগে মোগল-পাঠানের গোলামিও আমাদের করতে হয়েছে, তখন একথা অস্বীকার করবার আর উপায় থাকে না যে, আমাদের মধ্যে এমন একটা-কিছু আছে যা দেখলে অপর জাতের আমাদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বার বিষম একটা প্রলোভন হয়। যারা লাফিয়ে এসে আমাদের বুকে চড়ে' বসে, তাদের যত খুসি বাপান্ত করতে পার, কিন্তু মনের কোণে এ প্রশ্নটাও দেখা দেয় যে, দুনিয়ায় এত দেশ থাকতে, আমাদের পোড়া কপালই বা বারবার পোড়ে কেন?

মোগল সাম্রাজ্য যখন ভেঙ্গে পড়লো তখন ইংরেজ সুধু কুঠিওয়ালা হয়ে দেখা দিয়েছে। সম্রাট হয়ে মসনদে বসবার কল্পনা তখনও তার মাথায় গজিয়ে ওঠেনি। প্রবল পরাক্রান্ত জমিদারের তখন বাংলায় অভাব ছিল না। স্বাধীন মানুষের চামড়া যদি তাঁদের গায়ে থাকতো, তা'হলে বাংলার ইতিহাস বদলে যেতে পারতো। দেশকে স্বাধীন করা চুলোয় যাক, তাঁরা পাঁচজনে বুদ্ধি এঁটে দেশটাকে ক্লাইভের হাতে তুলে' দিয়ে নিজেরা যে গোলাম সেই গোলামই রয়ে গেলেন। দেশের যারা চাষা-ভুষো তারা কোনোদিনই এ সব ব্যাপারের খোঁজখবর রাখতো না; তখনও রাখলে না। দেশের যাঁরা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত তাঁরা 'তৈলাধার পাত্র' কি 'পাত্রাধার তৈল', এই গভীর প্রশ্নের মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত এ সব ছোটখাট ব্যাপারে মন দেবার সময় পেলেন না। আর যাঁরা তোমার-আমার মত না-জমিদার, না-চাষা, না ব্রাহ্মণপণ্ডিত, তাঁরা মধুর বৈষ্ণব-পদাবলী গান করতে করতে মূর্চ্ছা যাওয়া অভ্যাস করছিলেন; আর নানা তাল-মান-লয় সহকারে ভগবানকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন যে, তিনি মাখনের চেয়েও মোলায়েম, আর মধুর চেয়েও মিষ্টি। কিন্তু পোড়া ভগবান এমনি বেরসিক যে অত আদর অভ্যর্থনা পেয়েও আমাদের বুঝিয়ে দিতে ছাড়লেন না যে তিনি "ভয়ং ভয়ানকানাম্, ভীষণং ভীষণানাম্।"

দিন কতক না যেতে যেতেই 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' আরম্ভ হলো। বাংলার শহর অরণ্য হলো; গ্রামে শেয়াল কুকুর বাস

করতে লাগলো। ছেলে-বুড়ো আণ্ডা-বাচ্ছা মেয়ে মদ্দ সব দলে দলে পেটের জ্বালায় মরে' পচে' ভূত হয়ে গেলো।

ঐতিহাসিকেরা বলেন যে বাংলার তিনভাগের একভাগ লোক তখন মারা পড়েছিল। কিন্তু বাঙ্গালী তখন থেকেই এমনি অহিংস আর অবলা জাতি যে তার বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না। দলে দলে মুখ বুজে মারা গেল, কিন্তু কেন যে মরছে তা কেউ চোখ চেয়ে দেখলে না! বাংলার ইতিহাসে স্বধু একজনের নাম পাই ইংরেজ রাজত্বের প্রথমাবস্থায় যাঁর মনে স্বাধীনতার কল্পনা জেগেছিল—তিনি মহারাজ নন্দকুমার। কিন্তু ইংরেজের ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলে তাঁকে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল।

তারপর থেকে এই দেড়শ' বছর ধরে' লাথির উপর লাথি আর ঝাঁটার উপর ঝাঁটা আমাদের পিঠে পড়েছে। আমরা নিতান্ত অসহায়ের মত কেঁদেছি, রাগ করেছি, অভিমান করেছি, কিন্তু খাঁটি মানুষের মত দাঁড়িয়ে উঠে আত্মনির্ভরশীল হয়ে গোড়ার রোগের প্রতিকার করবার চেষ্টা কখনো করিনি। যাদের মনে সে সঙ্কল্প উঠেছে তাদের পাগল বলে' উড়িয়ে দিয়েছি, নয়ত ধর্ম্মের ভান করে' তাদের কথা ধামাচাপা দিয়েছি। আজ সমস্ত জাতটা মরবার পথে দাঁড়িয়েছে—পেটে ভাত নেই, কোমরে কাপড় নেই, শরীরে বল নেই, বোধ হয় জোর করে' কাঁদবার পর্য্যন্ত সামর্থ্য নেই। আজও স্বধু কথার প্যাঁচকাটাকাটি চলেছে; আজও থুতু দিয়ে ছাতু গেলবার চেষ্টায় আছি। মনকে চোখ ঠারার আর আমাদের অন্ত নেই।

যে মন সব কাজের গোড়া সেই মনই আমাদের যেন অসাড়, নির্জ্জীব, পঙ্গু হয়ে রয়েছে। বাইরের উত্তেজনার অভাব হলেই আমাদের সব উৎসাহ জুড়িয়ে যায়। পুলিশে যতক্ষণ ধরপাকড় করে, সভাসমিতি ভাঙ্গে, বক্তৃতা বন্ধ করে' দেয়, লাঠি বা গুলি চালায়, ততক্ষণ আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনটা চলে ভাল, কেননা আমাদের দেশের কাজের ধারণা ততটা সৃষ্টিমূলক নয় যতটা প্রতিবাদমূলক। আমাদের মারতে মারতে স্বরাজ পর্য্যন্ত পৌঁছে দেবার ভার আমরা যেন ইংরেজের হাতে তুলে' দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি। যদি পুলিশের অত্যাচার বন্ধ হয়ে যায় তা'হলে বোধ হয় আমাদের রাজনীতিচর্চ্চার ব্যবসাটাই মারা পড়ে।

কেন এমন হয়? হয় এইজন্যে যে আমাদের ভিতর অন্তরের স্বাধীনতা এখনও জাগেনি। পরাধীনতার যন্ত্রণা যখন অসহ্য হয়, তখন আমরা খুব খানিকটা চীৎকার করি; আবার পরক্ষণেই সব কথা ভুলে যাই। আর দুর্ব্বলের মত আত্ম-প্রবঞ্চনা করে' নিজেদের মনকে প্রবোধ দিই যে এই বিস্মৃতির নামই ক্ষমা, আর এই দুর্ব্বলতার নামই অহিংসা। দেশের আত্মা যদি আমাদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করতো, তা'হলে তাকে বাইরে একটা রূপ দেবার জন্যে আমরা ব্যগ্র হয়ে উঠতাম; কিন্তু সে রূপ আমাদের নিজেদের মনেও এখনও ফোটেনি। আমরা দেশসেবার 'নেতি নেতি'র দিকটাই দেখেছি, 'ইতি'র দিকটার সন্ধান এখনও পাইনি। স্বাধীন দেশকে কি রূপ দিতে হবে তা আমাদের নেতারা এখনও জানেন না। তাই আমাদের স্বাধীনতার চেষ্টার মধ্যে

আনন্দের বেগ নেই। আছে সুধু ফাঁকা আওয়াজ আর ব্যর্থ রোদন।

এই অভাবাত্মক স্বদেশ প্রেম দিয়ে কোনো কাজ হবে না। চাই স্বাধীন ভারতের একটা ভাবাত্মক রূপ, আর তাকে বাইরে মূর্ত্ত করে' তোলবার আগ্রহ। কি চাই তার একটা স্পষ্ট ধারণা যতদিন না হবে, ততদিন কংগ্রেসই বলো, আর কাউন্সিলই বলো, সব সুধু কবির লড়ায়ের আড্ডা হয়ে থাকবে।

৩রা মাঘ, ১৩২৯
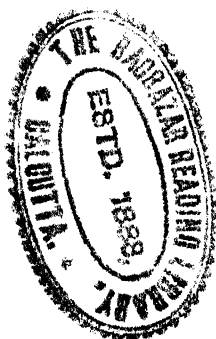
স্বদেশী স্বরাজ

তোমরা হয়ত আবার জিজ্ঞাসা করবে—"ও আবার কি ? সহোদর খুড়োর মত একটা কিম্ভুতকিমাকার ব্যাপার বলে' মনে হচ্ছে যে! স্বরাজ আবার বিদেশী হয় নাকি ?" আমি বলি—"হয়, দাদা হয়।" আর স্বুধু 'হয়' নয়; ডিউক অব কনট থেকে আরম্ভ করে' বড় বড় বাবু-ভায়ারা পর্য্যন্ত যাঁরা মনগড়া স্বরাজের নমুনা বাৎলেছেন, তাঁদের সব নমুনাগুলোর মধ্যে আমি একটা বোটকা বিদেশী গন্ধ পেয়েছি। তোমরা যদি না পেয়ে থাক, ত আমি বলবো যে তোমাদের নাকের জাত গেছে।

খাঁটি সত্যি কথা হচ্ছে এই, দেড়শ' বছর ধরে' বিদেশী ধুলো-কাদা আমাদের মনের উপর এত জমা হয়েছে যে, আমাদের নিজেদের সত্যিকার রূপটা আমরা এক রকম ভুলেই গেছি। কাজে কাজেই স্বরাজের নাম করে' যত মাল আমদানী করচি, তা একটু নাড়লে চাড়লেই Made in Europe-ছাপটা বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্চে। শুনতে পাই, স্বাধীনতা ধরবার একটা নাকি কল আছে, যার নাম ডেমক্রাশী, আর সেই কলের মধ্যে কোনো দেশের লোকগুলোকে ফেলতে পারলেই সেই দেশটা রাতারাতি স্বাধীন হয়ে

উঠবে। সেই ডেমক্রাশীর ষোড়শোপচারে পূজো দেবার জন্যে চাই একটা পার্লামেণ্ট, আর যদি recall আর referendumএর ব্যবস্থা করতে পার, ত একেবারে সোনায় সোহাগা! আজন্মকাল রাশি রাশি রাজনীতির পুঁথি ঘেঁটে বাবুভায়ারা এই জ্ঞানটুকু সঞ্চয় করে' আমাদের উপহার দিচ্ছেন।

অথচ ফরাসী-বিপ্লব থেকে আরম্ভ করে' আজ পর্য্যন্ত যদি কোনো জিনিষের ব্যর্থতা প্রমাণ হয়ে থাকে ত এই ফাঁদ পেতে স্বাধীনতা ধরবার চেষ্টার। সেকালে বিদ্যাসুন্দরের মালিনী মাসী বলেছিল, "আকাশে পাতিয়া ফাঁদ, ধরে' দিতে পারি চাঁদ।" মালিনী মাসীর অনেক রকম বিদ্যের মধ্যে হয়ত চাঁদধরা বিদ্যেটাও ছিল; কিন্তু ফাঁদ পেতে স্বাধীনতা ধরতে বললে মালিনী মাসীকেও হার মানতে হতো!

দেখনা একবার তামাসা! ইউরোপের বড় বড় পণ্ডিতেরা মাথা ঘামিয়ে ঠিক করলেন যে, সবাইকে যদি ভোট দেবার ক্ষমতা দেওয়া যায় তা'হলে সবাই সমান হয়ে যাবে। Vox populi, Vox dei প্রভৃতি গালভরা কথাগুলো বড় বড় হরপে ছেপে লোকের চোখের সামনে জ্বল্ জ্বল্ করতে লাগল। কিন্তু পোড়া দুঃখ ঘুচ্ ল না। দেখা গেল যে সবাইকার ভোট দেওয়া সত্বেও জনকত ওস্তাদ অপরের মাথায় চাঁটি মেরে বেশ দুপয়সা গুছিয়ে নিয়েছে, আর টাকার জোরে যা খুসি তাই করে' বেড়াচ্ছে। যাদের টাকা আছে তারাই স্বাধীন, আর বাকি সবাই তাদের গোলাম। পার্লামেণ্ট ফার্লামেণ্ট যা কিছু বল, সব ঐ টাকার

থলির ভেতর। তখন আবার হৈ হৈ পড়ে' গেল। টাকার যাতে সমান সমান ভাগ-বাঁটরা হয় তার ব্যবস্থা কর। এই চেষ্টার ফলে জন্মেছে সমাজতন্ত্র (Socialism)। কিন্তু সমাজতন্ত্র যেখানে প্রবল সেখানে আইন-কানুনের চাপে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাটা একেবারে মারা যাবার দাখিল হয়েছে। স্বাধীনতা বাঁচাতে গেলে সাম্য থাকে না, আর সাম্য বাঁচাতে গেলে স্বাধীনতা মারা যায়। এই এখন ইউরোপের সমস্যা। রুশিয়ার কম্যুনিষ্টরা বলছে, সবাইকে গায়ে-গতরে সমান খাটাও, আর সমান ভাবে খেতে-পরতে দাও তা'হলেই সব সমান হয়ে যাবে। মানুষ যদি খাবার আর খাটবার একটা যন্ত্র হতো, তা'হলে এ ব্যবস্থা চলতে পারতো, কিন্তু পেট আর হাত-পা ছাড়া মানুষ তো আরও কিছু? সেটুকুর ব্যবস্থা কি হবে?

এই সব গতিক-গতাক দেখে একদল বলছে—সব শাসন-মাসন ভেঙ্গে ফেলে দাও। আইন-কানুন পুড়িয়ে দিয়ে মানুষকে অবাধে ছেড়ে দাও—দেখ যদি তা'হলে কিছু হয়!

এই তো ইউরোপের অবস্থা। মোট কথা, মানুষ যে কি জিনিষ তা তারা জানে না; তাই সেখানে বজ্র আঁটন আর ফস্কা গেরো। স্বাধীনতার নাম দিয়ে যদি এই সব শাসনপ্রণালী আমাদের দেশে আমদানি কর তা'হলে জাতও যাবে, পেটও ভরবে না।

তাই আমরা চাই, একেবারে খাঁটি স্বদেশী স্বরাজ—মানুষকে আইনের বাঁধনে বা শাসনের পেষণে এক করা নয়। সবাই

যে এক আত্মার বিকাশ এই সত্যটি অন্তরে অন্তরে অনুভব করে' সেটাকে বাইরে ফুটিয়ে তোলা। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি—সব নীতিই হবে আত্মনীতি, আমার নিজেকে মানুষের জীবনে প্রকাশ করবার ভঙ্গী। তার গোড়ার কথা সাম্যও নয়, অহঙ্কারের স্বাধীনতাও নয়—গোড়ার কথা হচ্ছে আত্মার একত্ব।

সে একত্বকে পেতে গেলে বাইরের শত প্রলোভন ছেড়ে অন্তরের দিকে মুখ ফেরাতে হবে, Compromise (রফা)-এর কথা ভুলে যেতে হবে, কোন্ লাট সাহেব কি 'দিল্লীকা লাড্ডু' নিয়ে আসছে তার আলোচনা ছাড়তে হবে।

নিজেকে যদি পাও, ত নিজের শক্তিতে সব গড়ে' উঠবে। বাইরের বাঁধন খুলে' ফেলবার শক্তি ভারতের অন্তরেই আছে। চাই সাধনা, চাই শ্রদ্ধা, চাই আপন-ভোলা পণ।

২রা বৈশাখ, ১৩২৮
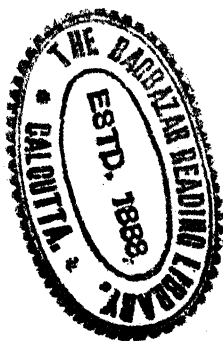
স্বরাজ সৃষ্টি

এদেশে স্বরাজের রূপটি ঠিক কি হবে বা হওয়া উচিত তার নিখুঁত বিবরণ এখন থেকে দিয়ে দিতে পারেন, এত বড় দূরদর্শী কেউ আছেন বলে' আমাদের মনে হয় না। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা, রুষিয়া, জাপান—রাষ্ট্র হিসাবে এরা সবাই স্বাধীন। কিন্তু নিজের নিজের প্রকৃতি অনুসারে প্রত্যেক দেশেই রাষ্ট্র ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে গড়ে' উঠেছে। রাষ্ট্র আর কিছুই নয়—যাঁরা রাষ্ট্র গড়েছেন তাঁদের সমবেত ইচ্ছাশক্তি প্রকাশের একটা যন্ত্র মাত্র। কাজে কাজেই রাষ্ট্র যাঁরা গড়েন, তাঁদের প্রকৃতি যেমন, রাষ্ট্রের প্রকৃতিও তেমন।

শাসনযন্ত্র গঠন বা পরিচালনের অধিকার যে সমস্ত দেশে অল্প সংখ্যক লোকের হাতে ন্যস্ত, সে সব দেশ বিদেশীর অধীনে যদি না-ও হয় তবু প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন নয়। সব রকম পরবশতাই দুঃখের কারণ; দেশের লোকের হাতে যদি গুঁতো খেতে হয় ত সে গুঁতো যে বিদেশীর গুঁতোর চেয়ে মিষ্টি হবে তা মনে করবার কোনো কারণ নেই। ইউরোপ বা আমেরিকায় সেইজন্য দেশের সমস্ত লোকের উপর শাসনযন্ত্র গঠন ও পরিচালনের অধিকার দেবার চেষ্টা অনেকদিন থেকেই চলেছে।

আমাদের দেশে স্বরাজের রূপ নির্ণয় করবার পূর্ব্বে এই কথাটা স্থির করা দরকার, কাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করবার জন্যে আমরা স্বরাজ চাই। দেশের সর্ব্ব সাধারণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয়, তা'হলে জনকতক শিক্ষিত বা উচ্চ বর্ণের লোকের উপর শাসনভার অর্পণ করে' আমাদের নিশ্চিন্ত হওয়া চলবে না; কেননা অতীত অভিজ্ঞতার ফলে এইটুকু আমরা বেশ বুঝতে পেরেছি যে, দরিদ্রের বা অশিক্ষিতের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে খেতে শিক্ষিত বা অভিজাত সম্প্রদায় কোনো দেশেই সঙ্কোচ করেনি। হিন্দু আমলে যখন রাজশক্তি ছিল ক্ষত্রিয়দের হাতে, তখন দেশের স্বাধীনতার জন্য শূদ্রদের গৌরব করবার বিশেষ কোনো কারণ ছিল বলে' মনে হয় না। আজও মধ্য-ভারতের যেসব জায়গায় ক্ষত্রিয় রাজা ভাঙ্গা সিংহাসনে বসে' রাজ্য শাসনের ভাণ করে' থাকেন, সেইসব জায়গায় রাজার কোনো স্বজাতির রাস্তা দিয়ে চলাচলের সময় নিম্নবর্ণের লোককে রাস্তা ছেড়ে একপাশে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। দেশ স্বরাজ পাবার পর যদি শাসনের অধিকার ঐ সব উচ্চবর্ণ বা ধনীলোকের হাতে গিয়ে পড়ে ত দরিদ্র বা নিম্নবর্ণের লোকের সে রকম স্বরাজলাভের ফলে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মাত্রা যে খুব বেশী বাড়বে তা মনে হয় না।

এতদিন পর্য্যন্ত স্বরাজলাভের চেষ্টা উচ্চশ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু বহু ব্যর্থ চেষ্টার ফলে তাঁদের এইটুকু জ্ঞান আজ হয়েছে যে, দেশের মধ্যে যারা সংখ্যায় শতকরা আশীজন তাদের ছেঁটে ফেলে কোনো প্রচেষ্টারই সফল হবার সম্ভাবনা নেই।

তাই তাদের সাহায্য লাভ করবার চেষ্টা অল্পবিস্তর আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু আমাদের এই সহানুভূতি যদি কার্য্যোদ্ধারের উদ্দেশ্যেই জন্মে থাকে, এর মূলে যদি গভীর সমবেদনা না থাকে, তা'হলে আমাদের দেশের স্বরাজ স্বধু আংশিক হয়েই থাকবে, আর আমাদের হাতের অস্ত্র একদিন ঘুরে এসে আমাদের মাথায় পড়াও বিচিত্র নয়।

কংগ্রেসে স্বরাজের আদর্শ আর স্বরাজ লাভের প্রণালী নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে; কিন্তু আমাদের মনে হয় যে ইংরেজের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কতটুকু থাকা উচিত বা উচিত নয়; অহিংসা-মন্ত্রে কার্য্যোদ্ধার হবে, না অহিংসা-নীতি ভবিষ্যতে কখনও ত্যাগ করতে হবে—এসব প্রশ্ন মীমাংসা করবার আগে আমাদের মীমাংসা করতে হবে যে সমগ্র দেশকে আমরা কতটুকু আপনাদের আয়ত্বের মধ্যে আনতে পেরেছি, দেশের জন সাধারণের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ আর স্বাধীনতাস্পৃহা কতটুকু জাগিয়ে তুলতে পেরেছি। স্বরাজ যে স্বধু তোমার আমার বা জনকত ভদ্রলোকের সুবিধার জন্য নয়, ভারতের প্রত্যেক নরনারীর পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশের পক্ষে যে তা একান্ত প্রয়োজনীয় একথা যদি আমরা নিজেদের বর্ত্তমান আচরণ দিয়ে বুঝতে দিতে না পারি তা'হলে স্বরাজ ফাঁকা কথাতেই পর্য্যবসিত হবে।

আজ যাঁরা অন্যায় আইনের প্রতিবাদ করে' কারাযন্ত্রণা বরণ করে' নিচ্চেন তাঁরা আমাদের নমস্য, তাঁদের স্বার্থত্যাগ আমাদের অনুকরণীয়—কিন্তু যাঁরা স্বধু জেলে গিয়েই তৃপ্ত নন্,

তাঁদের আমরা মনে করিয়ে দিতে চাই যে ইংরেজের আইন-কানুনই আমাদের পরাধীনতার মূল কারণ নয়। সেই মূল কারণ যদি অন্বেষণ করতে যাই ত কোটি কোটি জন সাধারণ, যারা অসাড়, অজ্ঞ, দুর্ব্বল, দরিদ্র, দায়িত্ববোধহীন হয়ে পড়ে' আছে, এ দেশকে স্বদেশ বলে' বোঝবার অবসর যারা কখনো পায়নি, তাদের মধ্যেই অনুসন্ধান করতে হবে। সেইসব অসাড় প্রাণে আশার সঞ্চার করতে হবে, দুর্ব্বল বাহুতে বলের সঞ্চার করতে হবে, সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করে' তাদের মনে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস জন্মে দিতে হবে। সেই লুপ্ত চৈতন্য যদি উদ্ধার করতে পার, তা'হলে তার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ স্বরাজ আপনা আপনিই গড়ে' উঠবে; স্বরাজের রূপ নিয়ে নেতৃবৃন্দের অযথা মাথা ঘামাতে হবে না।

আজ বার বার আমরা এই কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে বিনা বাক্যব্যয়ে হুকুম তামিল করতে শিক্ষা করা বা নিজেদের দায়িত্ব-বোধ নেতা-বিশেষের হাতে তুলে' দিয়ে যন্ত্রবৎ পরিচালিত হওয়া —এই লুপ্ত চৈতন্য উদ্ধারের প্রকৃষ্ট পন্থা নয়। প্রত্যেক ব্যষ্টি যদি স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে না শেখে, বা ষোল আনা দায়িত্ব বুঝে কাজ করতে অগ্রসর না হয়, ত সমগ্র জাতির মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা কখনো জাগবে না; জাতির শক্তি কখনো সংহত হয়ে উঠবে না, আর স্বরাজের নামে যা গড়ে' উঠবে তা সুধু স্বরাজের ভ্যাংচানি মাত্র।

বাংলার ছেলেদের কাছে আজ আমাদের তাই এই অনুরোধ —আদেশের প্রত্যাশায় হাঁ করে' বসে' থেকো না। স্তুতি বা নিন্দার

তাড়নায় নিজেদের বৈশিষ্ট্য হারিও না। বাংলার যা প্রাণের কথা তা যেন অপরের কথার প্রতিধ্বনি মাত্র না হয়। বাংলাকে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দেবার কল্পনা করে' যাঁরা সুখ পান, তাঁরা সুখে সে-স্বপ্ন দেখতে থাকুন। কিন্তু তোমরা, বাংলার মাটিতে যাদের জন্ম, বাংলার অন্নে যারা পুষ্ট, বাংলার রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি যাদের নিশার স্বপ্ন আর দিবসের ধ্যান—তোমরা বাংলার গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে ছুটে গিয়ে বাংলার মাটিকে বুক দিয়ে আঁকড়ে ধর; তোমাদের প্রাণে যে বিদ্যুৎশক্তি জ্বলছে, তা বাংলার প্রত্যেক নরনারীর শিরায় শিরায় সঞ্চারিত করে' দাও। তোমাদের কেন্দ্র করে' বাংলার আশা, আকাঙ্ক্ষা, সাহস, সুখ, দুঃখ, বীর্য্য সমস্তই মূর্ত্ত হয়ে উঠুক। নামের কাঙাল তোমরা নও, যশের কাঙাল তোমরা নও—তোমরা তোমাদের সর্ব্বস্ব বাঙ্লার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে স্বরাজ-প্রসবিনী মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তির উদ্বোধন কর। তোমাদের অন্তরের সৃষ্টির আনন্দ, বাহিরে স্বরাজের শতদল হয়ে ফুটে উঠুক।

৬ই মাঘ, ১৩২৮
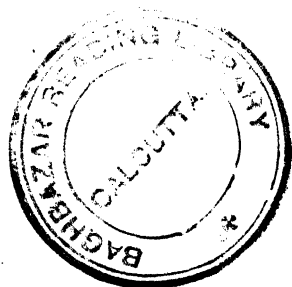
করে’ তুলবে, যা কথায় বার্ত্তায় চলনে ভঙ্গীতে বিশ্রামে কর্ম্মে নিজেকে মূর্ত্ত করে’ ধরবে। সেই স্বাধীনতার অনুভূতি যখন আসবে, তখন কর্ম্মপন্থার জন্য বেশী মাথা ঘামাতে হবে না। কর্ম্মপন্থায় মানুষ গড়ে না, মানুষে কর্ম্মপন্থা গড়ে।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯

একতার মূল

আজকাল 'একতা'র নাম করে' যে-জিনিষটাকে প্রচার করা হচ্চে, সেটাকে ঠাট্টা করতে গিয়ে মহা মুস্কিলে পড়েছি। বন্ধু-বান্ধবেরা চারদিক থেকে একেবারে 'গেল গেল' রবে চীৎকার করে' উঠেছেন। কেউ বলছেন—অসহযোগ আন্দোলনটা আমি মোটেই কিছু বুঝিনি ; অপরে বলছেন যে যদিও বা বুঝে' থাকি, তবুও যে-জিনিষটাকে সবাই ভক্তি-শ্রদ্ধা করচে সেটাকে নিয়ে ঠাট্টা করা ভাল হয়নি। তাতে নাকি কাজের ব্যাঘাত হবে !

ছেলেবেলায় যখন রঙ্গলালের কবিতা পড়েছিলুম,

একতায় হিন্দু রাজগণ
সুখেতে ছিলেন সর্ব্বজন
সে ভাব থাকিত যদি পার হয়ে সিন্ধুনদী
আসিতে কি পারিত যবন ?
—ইত্যাদি

—সেই সময় থেকেই আমার মনে এই প্রশ্ন উঠতো যে কোনো হিন্দু রাজারই-সৈন্য সংখ্যা কি পাঠান বা মোগলদের সৈন্য-সংখ্যার চেয়ে বেশী ছিল না ? ১০০৮ খৃষ্টাব্দে যখন সুলতান মামুদের সঙ্গে

জয়পালের ছেলে অনঙ্গপালের যুদ্ধ হয় তখন ত উত্তর ভারতের সব রাজাই অনেক সৈন্য-সামন্ত নিয়ে অনঙ্গপালের সাহায্য করেছিলেন। একতার কোনো অভাব হয়নি; হিন্দুদের সৈন্য-সংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে বেশী ছিল, তবু হিন্দুরা হেরে গেল কেন? রাজপুতেরা তখন একজোট হয়ে প্রাণপণে লড়েছিল। তারা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে কেউ প্রাণের ভয়ে পালায়নি। কিন্তু তাদের একতা সত্ত্বেও দেশের স্বাধীনতা রক্ষা হয়নি।

তারপর ইউরোপের দিকে চেয়ে দেখ। ইউরোপ তখন ঠিক ভারতবর্ষেরই মত ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সুবিধা পেলেই তারা পরস্পরের সঙ্গে লাঠালাঠি করতো। ভারতবর্ষের চেয়ে বেশী একতা তাদের ছিল না। কিন্তু একদিকে স্পেন, আর-একদিকে ভিয়েনা পর্য্যন্ত গিয়েই তুর্ক সৈন্যকে থেমে যেতে হয়েছিল। কেন?—একতার অভাব ত ইউরোপে যথেষ্টই ছিল; তবু ইউরোপ পরাধীন হলো না কেন?

এই 'কেন'র উত্তর যে কি সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে ভাববার অনেক অবসর এ জীবনে পেয়েছি। আমার মনে হয় যে আমাদের জাতটার প্রাণশক্তির অভাব হয়েছে, অন্তরের আনন্দ আমাদের শুকিয়ে গেছে; রকম-বেরকম বিধি-নিষিধের চাপে এই শস্য-শ্যামলা বসুন্ধরার সঙ্গে নাড়ীর যোগ আমাদের ছিঁড়ে যাবার যোগাড় হয়েছে। মোগল, পাঠান বা ইংরেজের কাছে গোটাকতক লড়ায়ে হেরে গিয়েছি বলেই যে আমরা পরাধীন তা নয়—আমাদের অন্তরের পরাধীনতাই মোগল, পাঠান, ইংরেজকে ডেকে এনে

আমাদের ঘাড়ের উপর বসিয়ে দিয়েছে। পলাসীর যুদ্ধের ফলে ইংরেজ বাংলার মসনদে উঠে বসেনি। আমাদের মনগুলো নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিল বলেই রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি দেশের সেকালের রাজনৈতিক পাণ্ডারা 'একতাবদ্ধ' হয়ে ক্লাইবের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।

সুধু কুচকাওয়াজ বা ড্রিলের জোরে এ পরাধীনতা সারবে না। রোগের মূল যেখানে সেইখানে আমাদের ওষুধ লাগাতে হবে। যাঁরা কর্ম্মী তাঁরা বাইরের কাজের মধ্যে একতা আনবার জন্যে স্বভাবতই ব্যস্ত। কিন্তু সে একতাকে স্থায়ী করতে গেলে এ জাতের মনের গোড়ায় কাজের গোড়াপত্তন করতে হবে; এ জাত যেখানে সত্য সত্যই এক, সেইখানে কাজের বনিয়াদ গাঁথতে হবে।

আমাদের পুঁথিতে বলে যে শক্তির তিন রূপ—ইচ্ছা, জ্ঞান, আর ক্রিয়া। কোনো কাজ করতে গেলে একটা অভাব বোধ আর সেই অভাব ঘোচাবার তীব্র ইচ্ছা থাকা চাই। তারপর কি করে' সে-কাজটা করতে হবে সে-সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট জ্ঞান থাকা চাই। এই ইচ্ছা আর জ্ঞানের মধ্যে যদি কোনো রকম গোঁজামিল থাকে তা'হলে বাইরের কাজের মধ্যে সে গোলমাল ফুটে বার হবে। একটা যা তা কাজ অবলম্বন করে' একতা গড়া চলে না।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে যখন সুরাট কংগ্রেস ভেঙ্গে যায় তখন এদেশের মডারেটরা 'একতা চাই, একতা চাই' বলে' চীৎকার করে'

উঠেছিলেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের Bengalee কাগজখানা পড়ে' দেখো একতার গুণ-কীর্ত্তনে একেবারে ভরা। কিন্তু তখন যদি দেশের লোক একতার খাতিরে মডারেটদের কথায় সায় দিয়ে যেত, তা'হলে কি দেশের বিশেষ কিছু লাভ হতো? মডারেট-দের স্বাধীনতা পাবার ইচ্ছাও ছিল না, আর কি করে' সে স্বাধীনতা পেতে হয় সে সম্বন্ধে জ্ঞানও ছিল না। সুতরাং একতার খাতিরেও দেশ যে তাদের কাজে সায় দিতে পারেনি, তাতে দেশের লোকের লাভ বই লোকসান হয়নি।

আজ 'অহিংস অসহযোগ' আন্দোলনও দেশের কাছ থেকে একতার দাবী করছে। এ আন্দোলনের আদর্শ কি?—ইংরেজ সাম্রাজ্যের মধ্যে বা তার বাইরে স্বরাজ পাওয়া। আমার বিশ্বাস আদর্শের মধ্যে যেখানে অনিশ্চয়তা থেকে যায়, কর্ম্মপ্রণালীর মধ্যেও তা ফুটে বেরিয়ে পড়ে। ইংরেজ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে স্বরাজ পাওয়ার মানে যে কি তা আমি বুঝিনে। আমার মনে হয় ও একটা অর্থহীন, অসম্ভব ব্যাপার। আমি দেশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাই। তার মধ্যে কোনো গোঁজামিলের জায়গা রাখতে চাইনে। আর কি করে' যে সেই স্বরাজ পেতে হবে সে-সম্বন্ধেও আমি ষোল আনা ওঁদের কথা মানিনে। যেখানে কাম্যবস্তু লাভের ইচ্ছা, আর কি করে' লাভ করতে হবে সে সম্বন্ধে জ্ঞান—এই দুই বিষয়েই মিল নেই, সেখানে বাইরের কাজে মিল কোথা হতে আসবে?

যাঁরা মনে করেন যে একসঙ্গে কাজ করতে করতেই একতা

আসবে, আর সেই বাইরের মিলন থেকে ভিতরের মিলন শেষে গড়ে' উঠবে, আমি তাঁদের আর কিছুদিন অপেক্ষা করতে বলি। যেখানে মিলনের মূলে সত্য নেই, সেখানে উৎসাহ ফিকে হয়ে যাবে, কাজে শ্রদ্ধা থাকবে না, বাইরের সাফল্যের জন্য মন লোলুপ হয়ে উঠবে। আর তার অভাবে সব কাজ ভেঙে পড়বে। আমি ভিতর থেকে গড়তে চাই—এমন জিনিষ যা নিজের বেগে নিজের পথ সৃষ্টি করে' নেবে; যা ভিতরের, গোড়ার একতাকে বাইরে টেনে মূর্ত্ত করে' ধরবে।

২৪এ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯

রাজনৈতিক অধিকার ভেদ

ধর্ম্ম-সাধনায় যেমন অধিকার-ভেদ স্বীকার করি, রাজনীতি-চর্চ্চায় সেই রকম অধিকার-ভেদ স্বীকার করলে দোষ কি ?

ধর্ম্মের ব্যাপারে কোনো হিন্দুই বলে না যে, তার নিজের মত ও পথই একমাত্র সত্য। এক রকম আচার যে সকলকে মানতেই হবে সে রকম কোনো জবরদস্তি নেই। ধর্ম্মের চরম আদর্শ এক হলেও যার যেমন প্রকৃতি, যার যেমন জ্ঞান তার তেমনি পথ ধরে' চলবার অধিকার হিন্দুরা বরাবরই স্বীকার করে' এসেছে। আমার পথ তুমি ধরছ না বলে' তুমি যে ধর্ম্ম থেকে ভ্রষ্ট হবে, একথা হিন্দু কখনো বলেনি। তোমার আমার গন্তব্যস্থান এক হতে পারে, কিন্তু তাই বলে' তোমার আর আমার চলনের ভঙ্গী ঠিক যে একই রকম হতে হবে এর কোনো মানে নেই।

এই অধিকারভেদটুকু স্বীকার করা হয়েছে বলেই মতামতের গোঁড়ামিকে হিন্দু কখনও আমল দেয়নি। সব হিন্দুরই জীবনের আদর্শ হচ্ছে মুক্তি; কিন্তু কে কি পথ ধরে' সেই মুক্তির দিকে চলবে সে বিচার নিয়ে হিন্দুরা লাঠালাঠি করেনি। যার

যেমন প্রকৃতি, যার যেমন সামর্থ্য তার তেমনি অধিকার, তার তেমনি পথ।

রাজনীতির সাধনায় সেই অধিকারভেদটুকু মেনে নিলে অনেক গোলমাল চুকে যায়। ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনায় এই অধিকারভেদ একেবারে গোড়ার কথা। যাঁরা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সাধনাকে আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ করে' তুলতে চান তাঁদের এই অধিকারভেদ স্বীকার করতেই হবে।

আধ্যাত্মিক সাধনার আদর্শ যেমন মুক্তি, রাজনৈতিক সাধনার আদর্শ তেমনি স্বরাজ। যারা সেই স্বরাজের আদর্শ মানে না, তারা ভারতে জন্মালেও ভারত তাদের নিজের দেশ নয়। রাজনৈতিক সাধনার মধ্যে তাদের কথা না ধরলেও চলে। কিন্তু স্বরাজ যাদের আদর্শ তারা যে সবাই এক রাস্তা ধরে' চলবে, সেটা আশা করাই ভুল। প্রকৃতি আর বুদ্ধি অনুসারে লোক ভিন্ন পথ ধরে' চলবেই।

আমাদের মনে হয় যে, এই স্বরাজের আদর্শ স্বীকার করা ছাড়া কংগ্রেসের আর কোনো creed থাকা উচিত নয়; কর্ম্মপন্থা নিয়ে মতভেদ আছে বলে' লোকে যে কংগ্রেসের সভ্য হতে পারবে না, এটা দেশের লোকের উপর অত্যাচার। যে স্বরাজের আদর্শ স্বীকার করে সেই কংগ্রেসের সভ্য হতে পারবে, এই ব্যবস্থা থাকা উচিত।

কর্ম্মপন্থা নিয়ে মতভেদ চিরদিনই থাকবে—কেননা বুদ্ধিও সকলের এক রকম নয়। এত বড় একটা দেশে সব রকম কর্ম্ম-

প্রণালীরই স্থান আছে। তাই নিয়ে মাথা ফাটাফাটি করে' কোনো লাভ নেই।

সেদিন চট্টগ্রামের প্রাদেশিক বৈঠকে সভানেত্রী বলেছিলেন যে, হয়ত ভবিষ্যতে আমাদের ব্যবস্থাপক সভায় ঢোকবার দরকার হতে পারে। একজন মস্তবড় নেতা অমনি রায় দিলেন যে ঐ কথাটি বলায় বাঙ্গলা দেশের উঁচু মাথা হেঁট হয়ে গেল! কেন বাপু? রাজনৈতিক বুদ্ধিটা কি তোমাদেরই একচটে সম্পত্তি? না, যাঁরা কাউন্সিলে যাবার কথা তুলেছিলেন তাঁরা ত্যাগে, চরিত্র-বলে, স্বদেশ-প্রেমে তোমাদের চেয়ে কিছু কম? কেউ যদি সত্য সত্যই মনে করেন যে, কাউন্সিলে গিয়ে লড়াই করে' তিনি স্বরাজের রাস্তা পরিষ্কার করতে পারবেন, ত পাঁচজন মিলে তাঁর মুখ টিপে ধরলেই কি খুব বাহাদুরী হবে?

সত্যকথা বলতে গেলে স্বীকার করতেই হবে, অহিংসা অসহযোগের ফলে ভারত স্বরাজ পাবে কি না এ বিষয়ে অসহ-যোগীদের মধ্যেও সন্দেহ এসেছে। তাই মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ ও বাংলায় কাজের পন্থা বদলাবার কথা উঠেছে। একদল বলেন, গবর্ণমেণ্টের ভালমন্দ সব প্রস্তাবেই বাধা দিয়ে গবর্ণমেণ্টকে অতিষ্ঠ করে' তোল; আর-একদল বলেন তা নয়; স্বধু দেশের অহিতকর প্রস্তাবগুলোকেই বাধা দাও। আগামী কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে এইসব মতবাদের আলোচনা হবে।

আমাদের মনে হয় না যে, কাউন্সিলে গেলে বিশেষ কিছু লাভ হবে। তবে এখন যাঁরা দেশের প্রতিনিধি সেজে লোক

হাসাচ্ছেন তাঁদের পথ যে বন্ধ হবে, এটাও একটা মন্দ কথা নয়। আর তা ছাড়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের সময় দেশের মধ্যে স্বরাজের আদর্শ প্রচার করবার যে একটা যথেষ্ট অবসর পাওয়া যাবে—সেইটুকুই লাভ।

দেশের আসল কাজ কাউন্সিলে নয়, দেশের জনসাধারণের মধ্যে। অহিংস অসহযোগীরা দেশের মধ্যে যে প্রবল ভাবের বন্যা এনেছেন, তাতে তাঁদের কৃতিত্ব অক্ষয় হয়েই থাকবে; দেশকে সংঘবদ্ধ করবার জন্যে তাঁরা যত পরিশ্রম করেছেন এত আর কেউ করেনি। কিন্তু তবুও মনে হয় যে, তাঁদের শিক্ষা দেশ ষোল আনা মেনে নিতে পারবে না। মানুষ যতদিন মানুষ থাকবে ততদিন তার আত্মরক্ষার জন্যে বৈধ হিংসার প্রয়োজনও থাকবে। তাকে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার চেষ্টা চিরদিনই ব্যর্থ হবে। অহিংস অসহযোগীরা নিজেদের অধিকার লঙ্ঘন করেছিলেন বলেই বাংলা দেশের ছেলেরা আর তাদের কথায় তেমন সাড়া দিতে চাচ্চে না। দোষ ছেলেদের নয়।

আমাদের শেষ কথা এই যে, এত বড় দেশে সব রকম অধিকারীই আছে; সব রকম লোকেরই কাজ করবার জায়গা আছে। সকলকে এক জালে বাঁধবার চেষ্টা কোরো না—জাল ছিঁড়ে যাবে। তুমি তোমার রাস্তা ধরে' চল; আমি আমার রাস্তা ধরে' চলি। কেউ বক্তৃতা দাও, কেউ গান শোনাও, কেউ চরকা কাট, কেউবা অন্যকিছু করো। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সকলকেই এই পূজায় যোগ দিতে হবে। ক্ষত্রিয়কে বাদ দিয়ে শুধু

ব্রাহ্মণে বা স্থুধু বৈশ্যে এ ব্রত উদ্‌যাপন করতে পারবে না। নিজের নিজের রাস্তা ধরে' সকলে চল। পথের শেষে গিয়ে সবাই একসঙ্গে মিলবই মিলব।

৭ই আষাঢ়, ১৩২৯
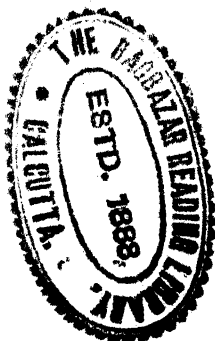
ভাবের ঘরে চুরি

সেদিন একখানা খাঁটি অসহযোগী ইংরেজি কাগজে পড়ছিলুম—আমরা দেশসুদ্ধ লোক যদি বিশুদ্ধ খদ্দর পরি, জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হয়ে সনাতন সভ্যতা বজায় রাখি, আর বিদ্বেষ, ঘৃণা ভুলে গিয়ে দেশের লোককে কোলে টেনে নিই, তা'হলেই স্বরাজ হয়ে গেল—ব্যস্ আবার কি চাই ?

খরগোসকে কুকুরে তাড়া করলে সেটা যেমন ছুটে ছুটে ক্লান্ত হয়ে শেষে একটা ছোটখাট গর্ত্তে মুখ লুকিয়ে ফেলে, কিম্বা চোখ বুজে বসে' থাকে আর ভাবে যে কুকুর তাকে দেখতে পাচ্ছে না—আমাদেরও তেমনি দশা হয়েছে। বেগতিক দেখলেই আমরা চোখ বুজে মনকে বোঝাতে চাই যে সস্তা দরে কাজ সেরে দেব। এ কথা ভুলে যাই যে খদ্দর পরে কোলাকুলি করে' জাতীয় বিদ্যালয়ে গেলেও আবার জালিয়ান-বাগ্ ঘটতে পারে। ঘরের ভিতর চোর ঢুকিয়ে চৌমাথার মোড়ে গিয়ে পাহারা দিলে কি হবে ?

সেকালে স্বদেশী-আন্দোলনের সময় একদল লোক স্বদেশী-আন্দোলনটাকে প্রধানতঃ নুণ, চিনি আর কাপড়ের বস্তার মধ্যে পুরে' রাখতে চেয়েছিলেন। তাঁরা ভাবতেন ঐটুকুর জোরেই স্বরাজ

পাওয়া যাবে। কিন্তু তা হয়নি; নুণ-চিনি-কাপড়ের বস্তা ফুঁড়ে স্বরাজ-আন্দোলনের রুদ্রমূর্ত্তি দেখা দিয়েছিল।

বারদোলির অনুশাসনের পর থেকে স্বরাজ-আন্দোলনটা ক্রমে স্বদেশী-আন্দোলন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। 'চুপ চাপ করে' চরকা কাট, খদ্দর পর, মদবিক্রী বন্ধ কর, ছুঁৎ-মার্গ ত্যাগ কর, তা'হলেই সব দুঃখ ঘুচে' যাবে।' এতে যে দেশের খানিকটা আর্থিক আর নৈতিক উন্নতি হবে তাতে কোনো ভুল নেই; কিন্তু বুকের উপর যে জগদ্দল পাথর চাপান রয়েছে তার ব্যবস্থা কি করবে? ল্যাঙ্কাশায়ারের পেটে খুব জোরে এক ঘা দিতে পারলে কর্ত্তারা খানিকটা খোঁচাখুঁচি করে' শেষে হয়ত একটু রফা করতে পারেন; কিন্তু সে রফায় ত আমাদের পেট ভরবে না। আমরা ত তা চাই না; আমরা যে একেবারে ষোল আনা স্বাধীনতা চাই। তার আয়োজন ত কিছু দেখতে পাচ্ছিনে।

জানি এসব কথা শুনলে তোমাদের রাগ হয়; কিন্তু সত্যি সত্যি একবার মনটাকে খুঁজে দেখ দেখি, ভাবের ঘরে কোথাও লুকোচুরি আছে কি না। দেশের অন্নবস্ত্রের সংস্থান কর, স্বাস্থ্যের উন্নতি কর, শিক্ষার ব্যবস্থা কর—এতো খুব ভালো কথা। কিন্তু এগুলো আগে সেরে নিয়ে তারপর 'রণং দেহি' বলে' তাল ঠুকে দাঁড়াবে এ ব্যবস্থার মানে কি? যে সমস্ত স্বাধীন দেশে রাজশক্তি প্রজাদের সহায়, সেখানকার লোকেও অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে; আর আমাদের এই পরাধীন দেশে যেখানে অর্থবলের একান্ত অভাব, যেখানে রাজশক্তি প্রজাদের

প্রতিকূল, সেখানে তোমরা এসব কাজ সেরে নিয়ে তারপর যদি আইনভঙ্গ আরম্ভ করতে চাও, তা'হলে এ যাত্রায় আর তোমাদের আইনভঙ্গ আরম্ভ করা হবে না। অন্নবস্ত্রের চিন্তা, শিক্ষার ব্যবস্থা আর সমাজ-সংস্কার—এসব তাড়াতাড়ি সেরে নেবার জিনিষ নয়; দেশ স্বাধীন হবার পরেও এ সমস্ত কাজে লেগে থাকতে হবে।

এ সমস্ত কাজের সঙ্গে রাজনীতির সম্বন্ধ মুখ্য নয়, গৌণ। রাজনীতির সঙ্গে মুখ্য সম্বন্ধ হচ্ছে আইনভঙ্গের। এই আইন-ভঙ্গটাকে স্থগিত রাখা হয়েছিল রক্তারক্তির ভয়ে। দেশকে শিক্ষা দিয়ে বা খদ্দর পরিয়ে একেবারে অহিংস করে' তুলতে পারা যাবে একথা মনে করবার যে বিশেষ কারণ আছে তা'ত দেখতে পাচ্ছিনে। সেদিন 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' কাগজে দেখেছিলাম মহাত্মাজীর এক শিষ্য লিখছেন যে এই অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে রাগ আর হিংসা ঢুকে' পড়েই সব মাটী করে' দিয়েছে। যতক্ষণ আমাদের মন থেকে রাগ-দ্বেষ না যাবে ততক্ষণ আমাদের এই সব কষ্ট সহ্য করা বৃথা হয়ে যাবে। বিনা ক্রোধে কষ্ট সহ্য করতে পারলে যে আধ্যাত্মিক শক্তির সৃষ্টি হবে সেই শক্তির কাছে নাকি অত্যাচারীর শক্তি পরাভব মানবে।

সাধুরা যখন তুরীয় তত্ত্বের কথা বলেন, তখন অনেক অসহ-যোগীকে তাই শুনে হেসে গড়াগড়ি দিতে দেখেছি, কিন্তু অসহযোগীদের এই ক্রোধ নিরশন ব্যাপারটা তার চেয়ে কম হাস্যকর বলে' ত মনে বোধ হয় না। দেশসুদ্ধ লোক আধ্যাত্মিক মুক্তি লাভ করে' তারপর রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্যে চেষ্টা করবে

—এটা যদি অসম্ভব ব্যাপার হয়, তা'হলে দেশসুদ্ধ লোক ক্রোধ জয় করে' তারপর স্বাধীনতার জন্যে অহিংস লড়াই করতে নামবে, এটাই বা অসম্ভব ব্যাপার হবে না কেন ? অহিংসা পরমধর্ম্ম কি না জানিনে, কিন্তু সেই নীতি আশ্রয় করে' যাঁরা দেশের স্বাধীনতা আনতে চান, তাঁদের রাজনীতির ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে বনে গিয়ে তপস্যা করাই ভাল।

অনেক গোঁড়া অসহযোগীর সঙ্গে কথা কয়েছি, কিন্তু অহিংসা নীতিটাকে সত্য সত্যই মানেন, এমন লোক খুব কমই দেখেছি। কিন্তু কাগজে লেখবার সময় যে-কথাটাতে তাঁদের বিশ্বাস নেই, সে কথাও খুব ঢাক পিটিয়ে প্রচার করতে তাঁরা ছাড়েন না। এটি ভাবের ঘরে চুরি নয় কি ? সোজাসুজি বললেই ত হয় যে অস্ত্রশস্ত্র নেই তাই নিরস্ত্র লড়াই করতে যাচ্ছি, তার মধ্যে অত তত্ত্বকথা আমদানী করবার দরকার কি ?

এ সমস্ত গোঁজামিল ছেঁটে ফেলে নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হওয়া ভাল। অন্নবস্ত্র বা শিক্ষা বিষয়ে দেশের স্বাধীনতা যেমন দরকার, শাসন বিষয়েও ঠিক তেমনি দরকার; সুতরাং কংগ্রেসের তরফ থেকে সব কাজেরই আয়োজন হওয়া চাই। এক রকম কর্ম্মী সব কাজে হাত দিতে পারেন না; তাই ভিন্ন ভিন্ন রকমের কর্ম্মীকে ভিন্ন ভিন্ন রকমের কাজ দেওয়া চাই। যাঁরা খদ্দর নিয়ে থাকতে চান, তাঁরা তাই নিয়ে থাকুন; যাঁরা শিক্ষা নিয়ে থাকতে চান, তাঁরা শিক্ষার ব্যবস্থা করুন; আর যাঁরা আইনভঙ্গ অভ্যাস করে' দেশটাকে গরম রাখতে চান, তাঁরাও বিসর্জ্জনের

বাজনা বাজাতে থাকুন। এ বিরাট কর্ম্মে সবাইকারই দরকার; কাউকে ফেললে চলবে না। আমাদের মনে হয় কংগ্রেস থেকে কাজকর্ম্মের ভাগাভাগির এই রকম একটা ব্যবস্থা হলে অনেক বাজে গোলমাল চুকে যায়।

২১এ আষাঢ়, ১৩২৯

দোষ কার?

অনেক উকিল-ব্যারিষ্টার অসহযোগ আন্দোলনের ধূমধামের সময় আদালত ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। এখন আবার তাঁদের মধ্যে দুচারজন আস্তে আস্তে আদালতে ফিরে যাচ্ছেন দেখে কংগ্রেস মহলে বেশ হৈ চৈ পড়ে' গেছে। আমাদের মনে হয় এতটা হৈ চৈ নিরর্থক। বেচারারা ৩১এ ডিসেম্বরের মধ্যে স্বরাজলাভের আশায় দলে ভিড়েছিলেন; এখন দেখছেন যে স্বরাজ পেতে গেলে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। এদিকে দুপয়সা রোজগার না করলে কাচ্ছাবাচ্ছাগুলো খায় কি? কংগ্রেসের মাসহারার উপর নির্ভর করে' ত আর চিরদিন চলে না!

আমাদের অনেক দিনের একটা পুরাণো ঘটনা মনে পড়ে' গেল। একজন মহা বৈরাগ্যবান জটাজুটধারী পরম সাধুর সঙ্গে আমাদের একবার দেখা হয়েছিল। ব্রহ্মতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব, প্রেততত্ত্ব, মুক্তিতত্ত্ব, নির্ব্বাণতত্ত্ব সম্বন্ধে ঘণ্টাকতক সদালাপ হবার পর আমি জিজ্ঞাসা করলুম—"বাবাজী, আপনার বাড়ীতে কে আছে? আপনার বৈরাগ্য জন্মাল কোথা থেকে?" সাধুজী বললেন—"বাড়ীতে জমিজমা আছে, দু বছর ধানচাল বেচে শ দু-তিন টাকা হাতেও পেয়েছিলুম;

কিন্তু বিয়ে করতেই সে টাকা খরচ হয়ে গেল। মেয়েটিও বয়সে ছোট। তাই মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল; সাধু হয়ে বেরিয়ে পড়লুম—তা দেখি দু-চার বছর ঘুরে-ফিরে। ব্রহ্মলাভ হলো ত হলো; নয়ত ঘরবাড়ী ত আর কেউ মারেনি!"

আমাদের উকিল বাবুদেরও সেই অবস্থা। ৩১এ তারিখের মধ্যে স্বরাজ মিললো ত ভালো কথা, নয়ত আদালত ত আর কেউ মারেনি! এই রকম যাঁদের মনের ভাব, তাঁদের নিয়ে বেশী টানাটানি করে' কোনো লাভ নেই।

তা ছাড়া আরও একটা কথা। জনকতক উকিল দলে রইলো কি আদালতে ফিরে' গেল তাতে এমন কি আসে যায়? দেশে যখন কর্ম্মীর অভাব ছিল তখন আদালত ভেঙ্গে উকিল আর কলেজ ভেঙ্গে ছেলে জোটাবার দরকার হয়েছিল। কিন্তু আজ আর ঠিক সেদিন নেই। কাজের মত কাজ দিতে পারলে কর্ম্মীর অভাব আজকাল আর হয় না।

দেশের মধ্যে যে কতকটা নিরুৎসাহের ভাব এসে পড়েছে তার জন্যে কর্ম্মীরা যতটা দায়ী, কংগ্রেসের কর্ত্তারা তার চেয়ে ঢের বেশী দায়ী বলে' মনে হয়। কথাটা একটু স্পষ্ট করে' বুঝিয়ে বলা দরকার।

ধরুন অসহযোগের গোড়াকার কার্য্যপ্রণালী। উপাধি-ওয়ালাদের উপাধি ছাড়তে হবে, উকিল-ব্যারিষ্টারদের আদালত ছাড়তে হবে, ছেলেদের কলেজ ছাড়তে হবে, ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের ব্যবস্থাপক সভা ছাড়তে হবে। কিন্তু এই উপাধিওয়ালা,

উকিল, ব্যারিষ্টার, কলেজের ছেলে আর ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মিলে দেশে কতজন হয়? তেত্রিশ কোটী লোকের মধ্যে লাখখানেক লোকের জন্যে ব্যবস্থা দেওয়া হলো। বাকি সবাই কি হাঁ করে' বসে' থাকবে? এঁরাই দেশের সর্ব্বস্ব, আর বাকি সবাই কেউ কিছু নয়? এঁরা কজনে মিলেই কি দেশ উদ্ধার করে' ফেলবেন?

একটা জিনিষ আমাদের হাড়ে হাড়ে বুঝতে হবে। দেশের চাষা-ভূষো কুলি-মজুরদের যদি আমরা নিজেদের দলে টেনে নিতে না পারি, তা'হলে কস্মিনকালেও কিছু করে' উঠতে পারবো না। খুব জোর খানিকটা হল্লাগুল্লা করে' আর-এক-কিস্তি রিফর্ম আদায় করতে পারি, কিন্তু তা থেকে দেশের স্বাধীনতা আসবে না। সে স্বাধীনতা পেতে গেলে স্বধু জনকতক ভদ্রলোকের ছেলেকে নিয়ে কাজ করলে চলবে না, দেশের কুলি-মজুর চাষা-ভূষোদেরও চাই।

এই চাষা-ভূষোদের মধ্যে দিনকতক বেশ উৎসাহ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সেটা কমে' গেল কেন, তা কি ভেবে দেখেছ? আমাদের আধ্যাত্মিক স্বরাজের জন্যে তাদের প্রাণ কেঁদে ওঠেনি। স্বরাজ মানে তারা স্বধু এইটুকু বুঝত যে, তাদের খাজনা-ট্যাক্সের জ্বালা কমে' যাবে; জমিদার, পুলিসের হাত থেকে তারা বাঁচবে আর পেট ভরে' খেতে পাবে। সেই আশাতেই তারা আমাদের সঙ্গে এসে জুটেছিল। কিন্তু আমরা তাদের দুঃখটাকে নিজেদের করে' নিতে পারিনি।

বারদোলির অনুশাসনে কতকটা ওদিকে নজর দেওয়া হয়েছে;

কিন্তু গৌণভাবে, মুখ্যভাবে নয়। খদ্দর নিজেদের হাতে তৈরী করে' নিতে পারলে চাষাদের দুঃখ কতকটা ঘুচবে, মদ খাওয়া ছাড়লে কুলি-মজুরদের অবস্থা একটু ভালো হবে; অনাচরণীয় জাতকে আচরণীয় করে' নিতে পারলে তাদের সহানুভূতি পাওয়া যাবে। ঠিক কথা; কিন্তু স্নধু এইটুকুই যথেষ্ট নয়। চাষা-ভূষোদের আর কুলি-মজুরদের প্রাণের কথা যে কি, তা তারা বেশ স্পষ্ট করেই বলেছে, কিন্তু আমরা সেদিকে নজর দিইনি। পাড়াগাঁয়ে গেলেই লোকে আগে জিজ্ঞেস করে—"বাবু, চৌকিদারী টেক্সটা উঠিয়ে দিতে পার? নুণের টেক্সটা উঠাতে পার?" কিন্তু তাদের সে কথাগুলো ধামাচাপা পড়ে' গেছে। সারা হিন্দুস্থান আর রাজপুতানা জুড়ে' গ্রামে গ্রামে কৃষাণ-সভার সৃষ্টি হলো; লোকেরা জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়াই করলে। কিন্তু কংগ্রেস তাদের পরকালের দিক চেয়ে শান্তশিষ্টভাবে কষ্ট সহ্য করবার উপদেশ দিয়েই নিজের কর্ত্তব্য শেষ করলেন। তাদের দুঃখ ঘোচাবার চেষ্টাটা কংগ্রেসের কাজের অঙ্গীভূত হলো না। দেশের এক কোণ থেকে আরম্ভ করে' আর-এক কোণ পর্য্যন্ত কলের মজুরদের ধর্ম্মঘটে ছেয়ে গেল। কিন্তু তাদের জন্যে লড়াই করা কংগ্রেসের কাজ বলে' গণ্য হলো না। ফলে তালুকদারদের হাতে আর সরকারী সেপাই বাহাদুরদের হাতে মার খেয়ে তারা নিরুৎসাহ হয়ে পড়লো।

আজ আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা শোনান বা উকিল-ব্যারিষ্টারদের পিছু পিছু তাড়া করে' যাওয়া কংগ্রেসের বড় কাজ নয়; বড় কাজ

হচ্চে দেশের ঐ অসহায় চাষা-ভূষো আর কুলি-মজুরদের সংঘবদ্ধ করে' খাড়া করে' তোলা। ওদের যা-কিছু অভাব অভিযোগ তা দূর করবার চেষ্টা কংগ্রেসের কার্য্যপ্রণালীর অঙ্গ করে' নিতে হবে; ওদের দুঃখকে আমাদের দুঃখ করে' নিতে হবে; ওদের সঙ্গে সমানে খাটতে হবে, লড়তে হবে। জমিদার বা কলওয়ালাদের মুখের দিকে চেয়ে বা বাজে আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়ে যদি সে কাজ থেকে হটে আসি, তা'হলে এরা সহজেই হাতছাড়া হয়ে যাবে, আর কংগ্রেসের বিরাট আয়োজন শেষে জনকতক বাবুভায়ার কাঁদুনিতে পরিণত হবে।

২৮এ আষাঢ়, ১৩২৯
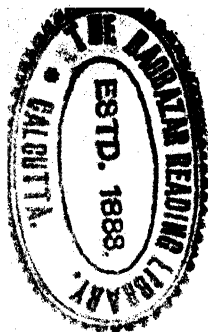
কেন এমন হলো ?

যাঁরা পল্লীগ্রাম থেকে ঘুরে ফিরে আসছেন তাঁরাই জিজ্ঞেস করছেন—কেন এমন হলো ? লোকের আর তেমন উৎসাহ নেই, আশা নেই ; সবাই যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। চরকাগুলো পড়ে' আছে, লোকে আর তেমন মন দিয়ে কাটে না ; মন তাদের মুসড়ে গেছে।

পুলিশের ঠ্যাঙ্গানি এর কতকটা কারণ, কিন্তু পুরো কারণ বলে' আমাদের মনে হয় না। দাউ দাউ করে' যদি আগুন জ্বলে' উঠতো, তা'হলে সে-আগুনকে কম্বল চাপা দিয়ে নিবিয়ে দেওয়া যেত না, কম্বলেও আগুন লেগে যেত। আমাদের মনে হয় যে, দেশের জনসাধারণকে আমরা এখনও নিজেদের দলে টানতে পারিনি। আমাদের স্বরাজের আদর্শে তাদের মন ঠিক মেতে উঠছে না।

আমাদের এক বন্ধু স্বরাজের আদর্শ প্রচার করবার জন্য গ্রামে গ্রামে দিন কতক ঘুরে' বেড়িয়েছিলেন। একজন বুড়ো নমশূদ্র জাতের চাষাকে তিনি আধঘণ্টা ধরে' বক্তৃতা দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে স্বরাজ না পেলে আর দেশের কোনো গতি হবে না। বুড়ো

বক্তৃতা শোনবার পর জিজ্ঞেস করলে—"বাবা ঠাকুর, তোমরা ত স্বরাজ পাবে, কিন্তু আমাদের কি লাভ হবে? আমাদের সেই সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত লাঙ্গল কাঁধে করে' ঘুরতে হবে; আর খাজনা-টেক্স দিতে না পারলেই জমিদারের নায়েব-গোমস্তার হাতে ঠ্যাঙ্গানি খেতে হবে। তার উপর দারোগাবাবুর নজর ত আছেই। তোমরা রাজ্য চালালেই আমাদের এ সব দুঃখ ত ঘুচবে না!" বন্ধু বললে—"না হে কর্ত্তা, তোমাদের এ সব দুঃখ আর থাকবে না।" বুড়ো উত্তর দিলে—"ঠাকুর, তার লক্ষণ ত কিছু দেখিনে। জমিদারও তোমরা, দারোগাও তোমরা; আমাদের জন্যে এ পর্য্যন্ত ত তোমাদের কখনো মাথা ঘামাতে দেখিনি। স্বরাজ পেলেই যে তোমরা বদলে যাবে তার মানে কি?"

ভাববার কথা বটে! আমরাই জমিদার হয়ে রকম-বেরকমে তাদের চুষে খেয়েছি। আমরাই দারোগা হয়ে তাদের ভিটেয় ঘুঘু চরিয়েছি, আমরাই সমাজের মাতব্বর হয়ে ব্যবস্থা দিয়েছি যে বাঁ পায়ের কড়ে আঙ্গুল দিয়ে তাদের স্পর্শ করলেও গঙ্গাজলে তিন শ তেত্রিশটা ডুব দিয়ে তবে শুদ্ধ হতে হবে। আজ হঠাৎ তাদের কাছে গিয়ে আধ্যাত্মিক স্বরাজের মহিমা ঘোষণা করতে গেলে তারা আমাদের কথা শুনবে কেন?

এ যাবৎকাল কংগ্রেসের তরফ থেকে দশ-বিশ হাজার আবেদন-নিবেদন করা হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে এই গরীবদের কথা বড় একটা নেই। তার কারণ সুধু এই যে এতদিন যাঁরা কংগ্রেস চালিয়ে এসেছেন তাঁরা সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। তাঁরা

নিজেদের সুখ-দুঃখের ভাবনাতেই মস্‌গুল। কোনোরকম করে' ইংরেজকে হটিয়ে দিয়ে নিজেদের হাতে ক্ষমতা নিতে পারলেই দেশের একটা গতি হয়ে যাবে, এই তাঁদের অন্তরের বিশ্বাস। কুলি মজুর চাষীদের দিকে চাইবার তাঁদের সময়ও ছিল না, প্রবৃত্তিও ছিল না।

জমিদারদের কথা ছেড়েই দি, কেননা ইংরেজের আইনের গুণেই তাঁদের লক্ষ্মীশ্রী হয়েছে, তাঁরা ইংরেজেরই হাতে-গড়া জীব। লাট কর্ণওয়ালীস জমিদারীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না করে' গেলে আজ জমিদার বাবুদের বংশধরদের ট্রামগাড়ির কনডাক্টারি করে' খেতে হতো। এখনও পর্য্যন্ত অনেক জমিদার প্রজাদের লেখাপড়া শেখাবার নাম শুনলে ভয় পান—পাছে প্রজারা একটু সেয়ানা হয়ে উঠলে তাদের জব্দ করবার সুবিধা না হয়!

জমিদার ছাড়া যাঁরা কংগ্রেস করে' দেশ উদ্ধার করতে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই উকিল ব্যারিষ্টার আর জনকত বড় বড় ব্যবসাদার। অবাধবাণিজ্য হলে এদেশের শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষতি হয়, তাই তাঁরা বিদেশী-পণ্যের উপর মাশুল বসাতে চেয়েছিলেন। বিদেশী এসে এদেশের বড় বড় সরকারী চাকরী পাচ্ছে, তাই তাঁরা সমস্ত সরকারী চাকরীতে দেশের বড় বড় লোক ভর্ত্তি করতে চাইতেন। এ খুব ভালো কথা; কিন্তু তাঁরা দেশের স্বায়ত্ব-শাসন বলতে নিজেদের অর্থাৎ এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আর্থিক সুবিধার জন্যে যা-কিছু করা দরকার তা ছাড়া আর বড় বেশী কিছু বুঝতেন না।

দেশের যারা জনসাধারণ, যারা চাষ করে আর পেটে হাত

দিয়ে শুকিয়ে মরে তারা তখন কংগ্রেসের বড় একটা ধার ধারতো না। তারা দূর থেকে দেখতো যে বাবুরা হাত-পা ছুঁড়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন, আর তাঁদের মুখে ফড়্ ফড়্ করে' ইংরেজীতে খই ফুটছে। তারা ভাবতো কংগ্রেসটা বাবুদের একটা আড্ডা দেবার জায়গা।

আজকাল হাওয়া বদলেছে। পেটের জ্বালায় দেশের চাষা-ভূষো কুলি-মজুর সবাই বুঝেছে যে, দেশের এ রকম অবস্থা থাকলে আর চলবে না; একটা কিছু ওলট-পালট না হয়ে গেলে আর এদেশ বাঁচবে না। তারা যখন স্বরাজের কথা শুনে আমাদের দলে এসে জুটেছিল তখন ভেবেছিল যে তাদের অন্নবস্ত্রের দুঃখটা ঘোচাবার ব্যবস্থা আমরা আগে করব।

তারা যে 'গান্ধী মহারাজের জয়' বলে' চীৎকার করেছিল, সেটা স্বধু স্বরাজের আদর্শে মুগ্ধ হয়ে নয়; তার ভেতর পেটের জ্বালাও অনেকখানি ছিল। তারা ভেবেছিল আমরা তাদের খাজনা-ট্যাক্সের বোঝা একটু হাল্‌কা করে' দিতে পারবো, তাদের অত্যাচার অবিচারের হাত থেকে বাঁচাবো। যাঁরা পাড়াগাঁয়ে গিয়ে অশিক্ষিত লোকদের সঙ্গে মেশবার স্থবিধা পেয়েছেন, তাঁদের জিজ্ঞাসা করে' দেখ, তাঁরা ঐ কথাই বলবেন। ঐ এক আশায় সাঁওতালেরা মদ ছেড়েছিল, কুলি-মজুরেরা জেলে ছুটেছিল, চাষা-ভূষোরা মরিয়া হয়ে উঠেছিল।

আর আমরা কি করলুম? তারা যখন কাপড়ের অভাব জানালে তখন আমরা বললুম—তুলোর চাষ কর, চরকা কাট, খদ্দর পর। বেশ কথা, তারা তাই আরম্ভ করে' দিলে। তারপর

যখন তারা জিজ্ঞেস করলে—'নায়েব মশায় আর দারোগা বাবুর হাত থেকে বাঁচাবার কি করলেন?'—তখন আমরা বললুম—'ওসব কথা এখন বোলো না, এখন মন দিয়ে চরকা কাট।' শেষে যখন বললে—'বাবু, দারোগার জ্বালায় যে আর বাঁচিনে।' তখন আমরা গম্ভীরভাবে বললুম—'পড়ে' পড়ে' মার খাও। আধ্যাত্মিক স্বরাজ পাবার ঐ রাস্তা।'

তারা চুপ করে' রইলো বটে, কেননা ভদ্রলোকের মুখের উপর কথা কওয়ার অভ্যাসটা তাদের এখনো হয়নি। কিন্তু বোধ হয় তারা মনে মনে ভেবেছিল—'ও-রাস্তায় যদি স্বরাজ পাওয়া যায় তা'হলে ত আমাদের অনেক দিন আগেই তা পাওয়া উচিত ছিল। চুপ করে' মার খাওয়া ত আমাদের চিরকেলে অভ্যেস। এটা শেখবার জন্যে এত ঢাক-ঢোল পেটাবার দরকার কি? যা নিয়ে আমরা জ্বলে মরছি, তাই যদি ঘোচাতে না পার ত ঐ রইল তোমার চরকা।'

তাই আজ মনে হয় কংগ্রেসের কাজের ধারাটা একটু বদলাতে হবে। আমাদের আধ্যাত্মিক স্বরাজকে তুরীয়লোক থেকে টেনে এনে আধিভৌতিক কাঠামের উপর বসাতে হবে। আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে নতুন নতুন পরীক্ষা করে' দুনিয়াটাকে নতুন ছাঁচে ঢালাই করবার দরকার হয়, তা কোরো—অনন্তকাল সুমুখে পড়ে' আছে। কিন্তু দোহাই তোমাদের—ঐ পরীক্ষাটা সুধু কুলি-মজুর বেচারীদের ঘাড়ের উপর দিয়ে কোরো না। তোমাদের পরীক্ষা শেষ হতে হতে তারা যে মরে' ভূত হয়ে যাবে!

১০ই শ্রাবণ, ১৩২৯

স্বাধীনতার রকমারি

সেদিন মির্জ্জাপুর পার্কে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতাটা শুনে অনেকে নাকি ভাবিত হয়ে পড়েছেন। তাঁরা বলেছেন—'এ আবার কি ? এ যে একেবারে নির্জ্জলা ধর্ম্মতত্ত্ব ! দেশবন্ধু যখন বলেছেন যে তিনি রাজনীতি চান না, অর্থনীতি চান না, তখন আমরা সবাই কি হাত-পা গুটিয়ে পড়ে' পড়ে' হাই তুলতে থাকব ?'

যাঁরা একথা বলেছেন তাঁরা দেশবন্ধুর কথার মর্ম্ম ঠিক বোঝেননি। তিনি এদেশে ইউরোপীয় রাজনীতি বা অর্থনীতি আমদানী করতে চান না। তিনি চান যে এদেশ স্বধর্ম্মের উপর নির্ভর করে' নিজের ভাবে গড়ে' উঠুক। পরের কাছে ধারকরা আদর্শে এ দেশকে গড়তে গেলে জাতও যাবে পেটও ভরবে না।

এ দেশের আদর্শ যাকে বলছি সেটা ফাঁকা কথা নয়, আধ্যাত্মিক ধোঁয়া নয়, খুব খাঁটি জিনিষ। ধর্ম্ম কথাটা কতকগুলো ধোঁয়াটে রকমের উপধর্ম্মের ঠেলায় সুধু ভাববিলাসিতা হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু আসলে ধর্ম্ম জিনিষটা মোটেই তা নয়। প্রত্যেকের যা স্বভাব সেইটাই তার স্বধর্ম্ম ; আর সেই অনুসারে তাকে পূর্ণ পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়াই ধর্ম্মসঙ্গত কাজ।

আমরা মুখে বলি স্বরাজ চাই ; কিন্তু স্বরাজ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ভারি অস্পষ্ট। ইউরোপের দেশগুলোর উপর অপর কোনো জাত কর্ত্তৃত্ব করে না, তাই আমরা তাদের বলি স্বাধীন। কিন্তু একটু খোঁজ করলেই বেশ দেখতে পাওয়া যায় যে সে-স্বাধীনতা কাগজে-কলমে যতখানি কাজের বেলায় ততখানি নয়। দেশের যারা চালাক লোক বা টাকাওয়ালা লোক তারাই শাসন-যন্ত্রটাকে নিজেদের সুবিধা মত চালাচ্ছে ; সাধারণ লোকের বড় বিশেষ কোনো ক্ষমতা নেই। যারা বড় বড় সওদাগর তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যাতে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে সেইজন্যে রকম-বেরকমের ওস্তাদী চাল চালা হচ্ছে ; জাল, জুয়াচুরি, লাঠিবাজি সবই বেমালুম চলে' যাচ্ছে। কিন্তু ভুগছে কে ? মরছে কে ? দেশের গরীব লোকগুলো। ও-সব দেশে বিদেশী রাজা নেই বটে, কিন্তু স্বদেশী মোড়লদের জ্বালাতেই তারা অস্থির। দেশসুদ্ধ লোক যেখানে ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে' পার্লামেণ্ট গড়েছে, সেখানেও দেশের লোকে পার্লামেণ্ট সভ্যদের হাতে খেলার পুতুল হয়ে দাঁড়িয়েছে, আর তা ছাড়া গবর্ণমেণ্ট যে কি চাল চালেন তা পার্লামেণ্টের সভ্যরাও অনেক সময় জানতে পারেন না। সকলকেই এক একটা ভোট দেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু সমান ভোটের ফলে আর্থিক বা রাজনৈতিক অবস্থা কারও সমান হয়ে দাঁড়ায়নি। স্বাধীনতার ফলে সাম্য আসেনি, মৈত্রীও আসেনি।

ইউরোপে বড় বড় কল-কারখানা বসেছে। কোটি কোটি টাকার জিনিষ রোজ রোজ তৈরী হচ্ছে। মারামারি কাটাকাটি

করে' দেশ-বিদেশে সে-সব জিনিষ বিক্রীর ব্যবস্থা হচ্ছে। দেশে ধামা ধামা টাকা আসছে। কিন্তু সে সব টাকা যাচ্ছে কাদের ঘরে? যারা সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত খেটে খেটে আধমরা হয়ে যাচ্ছে তারা সে টাকার সিকির সিকিও পাচ্ছে না। দেশের স্বাধীনতা অর্থ-বৈষম্য বা সামাজিক-বৈষম্য ঘোচাতে পারেনি।

তাই দেশবন্ধু বলেছেন যে আমরা এমন স্বাধীনতা চাই যা সুধু বিদেশীর হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করবে না, স্বদেশীর হাত থেকেও উদ্ধার করবে। আমরা দেশকে স্বাধীন করতে চাই, আর তার সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রত্যেক লোককে মানসিক, আর্থিক, রাজনৈতিক হিসাবে স্বাধীন করতে চাই। ইউরোপের লোকেরা আজ স্বাধীনতার নামে কল-কারখানার দাস হয়ে পড়েছে, পার্লামেণ্টের দাস হয়ে পড়েছে। আমরা কিন্তু এমন স্বাধীনতা চাই যা প্রত্যেক মানুষকে ষোল আনা মানুষ হবার অবসর দেবে; তাকে দাবিয়ে ছোট করে' রাখবে না; সম্প্রদায়ের নামে বা দেশের নামে বা সমাজের নামে তার মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব করবে না। যে সামাজিক অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক অবস্থা মানুষকে পরমুখাপেক্ষী করে না, আর তাকে স্বধর্ম্ম ফুটিয়ে তোলবার অবসর দেয় আমরা সেই রকম স্বাধীনতা চাই। স্বাধীন হওয়া আর স্বধর্ম্ম পালন করা একই কথা।

ইউরোপের যা আদর্শ, ইউরোপ সেই রকম অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান গড়ে' তুলেছে। সে-সবের ভিতর দিয়ে তার নিজের ভাব নিজের ধর্ম্ম প্রকাশ পেতে পারে। কিন্তু আমাদের আদর্শ যখন ভিন্ন,

আমাদের স্বধর্ম্ম যখন ভিন্ন, তখন ইউরোপের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের অনুকরণ আমাদের দেশে খাড়া করে' তুললে তা দিয়ে আমাদের আদর্শ ফুটে উঠবে না। আমাদের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান আমাদের নিজেদের ভাবের উপযোগী হওয়া চাই।

তোমরা হয়ত বলবে, আগে দেশটা ত স্বাধীন হোক্‌, তারপর ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কথা ভাবা যাবে। কথাটা শুনতে বেশ, কিন্তু ওটা ফাঁকা কথা। আমরা ভদ্রলোকের দল আমাদের সমাজের ঘাড়ে এমনি জোরসে চেপে বসে' আছি যে, সমাজ প্রায় নিস্পন্দ হয়ে পড়েছে। এখন যদি কোনো গতিকে বিদেশীর হাত থেকে রক্ষা পাই তা'হলে স্বেচ্ছায় যে নিজেদের ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে দেশের কুলি-মজুর চাষা-ভূষোদের দুঃখ দূর করবার জন্যে উঠে-পড়ে লাগবো, তা মনে করবার ত কারণ দেখি না। আমরাই না জমিদার? আমরাই না পুলিশের দারোগা? শেষে হয়ত একদিন ঐ চাষা-ভূষোদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।

আর তা ছাড়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এমন সামর্থ্য নেই যে জন-সাধারণের সাহায্য ছাড়া দেশকে স্বাধীন করে। আমরা যদি আজ স্বাধীন হতে চাই ত সকলকে আমাদের সমান স্বাধীনতা দিতে হবে। সকলে যদি স্বাধীনতার অশায় উদ্বুদ্ধ হয়ে না ওঠে, দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরা প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনতা ঘোষণা না করি তা'হলে দেশের পরাধীনতা ঘুচবে না।

দেশবন্ধু সেই পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শের দিকে লক্ষ্য করেই

বলেছিলেন, "আমি ইউরোপীয় রাজনীতি চাই না, ইউরোপীয় অর্থনীতি চাই না।" তিনি কোনো দলের নন্, তিনি সারা দেশের। আর এই দেশ কোনো সম্প্রদায়বিশেষের নয়, শ্রেণীবিশেষের নয়, শাসনকর্ত্তাবিশেষের নয়, এ দেশ ভগবানের।

তিনি এই কথাটা হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন যে সেই দেশই যথার্থ স্বাধীন যে দেশে সবাই রাজা, সবাই ভগবানের মূর্ত্ত প্রকাশ।

১৩ই ভাদ্র, ১৩২৯

চাই নূতন দল

অসহযোগ আন্দোলন চুপচাপ হয়ে গেছে। বুড়োরা যা ভাবেন তা মুখ ফুটে বলেন না; বড় বড় কথা দিয়ে আসল কথাকে চাপা দেন। ছেলেদের মনে ক্রমশঃ অন্য আশা অন্য আদর্শ জাগছে।

খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করা যায় কি না, এ বিষয়ে একটা মীমাংসা করবার জন্যে যাঁরা দেশময় ঘুরে' বেড়ালেন তাঁরা কি যে স্থির করেছেন তা তাঁরাই জানেন অথবা তাঁরাও ঠিক জানেন না। কোনো রকমে ও-ব্যাপারটা কিছু দিনের জন্যে চাপা দিয়ে রাখাই যেন তাঁদের মনের কথা বলে' বোধ হয়। মোট কথা, এর পরে যে কি করলে ভালো হয় তা তাঁরাও ঠিক করতে পারছেন না। অথচ সে-কথা স্পষ্ট করে' বললে বিদ্যে ফাঁক হয়ে যায়। তাই তা-না-না-না করে' কোনো রকমে গোঁজামিল দিয়ে কাজ চালান হচ্ছে। কর্ত্তাদের জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বলেন—'ওহে বাপু, গান্ধী মহারাজ যা হুকুম দিয়ে গেছেন তাই মন্ত্র কর।' অর্থাৎ চরকা চালাও আর বোঝ-আর-না-বোঝ, অন্ততঃ মুখে বল যে আমরা ঘোরতর আধ্যাত্মিক আর অহিংস।

মজার কথা এই, কামাল পাশা যখন গ্রীক বাহাদুরদের ধরে'

আচ্ছা করে' ঠুকে দিলেন, তখন মহা মহা অহিংস পুরুষেরা এক গাল হেসে ফেললেন। যাঁরা অহিংস ধর্ম্ম প্রচার করে' জগতে সত্যযুগ আনবার খেয়ালে বুঁদ হয়েছিলেন, তাঁরাও গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বললেন, "বাঃ কি ঠ্যাঙ্গানিটাই দিয়েছে!" কেউ বললেন—"কামালকে উড়ো জাহাজ বকসিস দাও।" কেউ বললেন—"একখানা তলোয়ার পাঠিয়ে দাও।" ভারতবর্ষ থেকে আঙ্গোরায় লোক পাঠিয়ে কামালের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করবার কথাও উঠেছে। এলাহাবাদের 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' কাগজ অহিংস অসহযোগীদের কাগজ। তাতেও লোককে যুদ্ধে পাঠাবার কথা খুব উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা করা হচ্চে।

এর সঙ্গে আমাদের যে গভীর সহানুভূতি আছে তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু অহিংসা প্রচার আর যুদ্ধে যাওয়া এক সঙ্গে কি করে' চলে তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। অহিংসাটা কি সুধু ভারতবর্ষের পক্ষেই ভাল, আর অন্য সব দেশের পক্ষে খারাপ? এ গোঁজামিল কেন? এ ভণ্ডামি কেন? সোজা কথা বলার সাহস না থাকে চুপ করে' থাকলেই ত হয়।

এক দলের ত এই অবস্থা। আর-এক দল, যাঁরা ঝোঁকের মাথায় আদালত ছেড়ে, কাউন্সিল ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন, তাঁরা আবার লোলুপ দৃষ্টিতে ঐ দিকে চাইতে আরম্ভ করেছেন। খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে' দিয়ে একটা পাকাপাকি করে' তোলবার জন্যে যে সাহস, ত্যাগ আর কর্ম্মকুশলতা দরকার তা তাঁদের নেই; অথচ চরকা হাতে করে' চুপ করে' বসে' থাকাও পোষায়

না। কাউন্সিলে গিয়ে বেশ ভালো করে' ইংরেজীতে গালাগাল দিতে পারলে তবু গায়ের ঝাল একটুখানি মরে। দেখে-শুনে যতদূর মনে হয় যে এই কাউন্সিলে গিয়ে ঝগড়াকরার দল গয়ার কংগ্রেসে বেশ প্রবল হবে। মহারাষ্ট্রে, বাংলায়, মান্দ্রাজে এ দলের লোক সংখ্যা যথেষ্ট। তাঁরা সবাই মিলে আদি ও অকৃত্রিম অসহযোগীদের হারিয়ে দেওয়াও বিচিত্র নয়। এঁদের অধিকাংশই উকিল, ব্যারিষ্টার আর পয়সাওয়ালা লোক। গোলমালের মধ্যে এঁরা যাবেন না। কাউন্সিলে চেঁচামেচি করে' বেড়ালের ভাগ্যে সিকে যদি ছেঁড়ে, অর্থাৎ ইংরেজ বাহাদুর আর-এক-কিস্তি রিফর্ম ঝেড়ে দেন, তা'হলেই এঁরা মডারেটদের মত সুশীল ও সুবোধ বালক হয়ে যাবেন। যে-সব লোক সত্যি সত্যিই ষোল আনা স্বাধীনতা চান, তাঁরা এ দল থেকে ক্রমশই বাতিল হয়ে পড়বেন।

সুখের কথা দেশে আর-একটা দল গড়ে' উঠেছে—সেটা শ্রমিকের দল; কুলি-মজুর চাষা-ভূষোর দল। আজ তারা নিরন্ন, অসহায়, অজ্ঞান; কিন্তু তাদেরও চোখ খুলছে, তাদের মুখেও বুলি ফুটছে, তারাও শত্রু-মিত্র চিনছে, তারাও সংঘবদ্ধ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এ স্বাধীনতার সংগ্রামে সবাই হয়ত নিজের নিজের পুঁটুলি বাগাবার চেষ্টা করবে। যাঁর জমিদারী আছে, তিনি প্রজাদের উপর মোড়লী করবার অধিকার পেলেই হয়ত ভুলে যাবেন; যাঁর কল-কারখানা আছে তিনি Fiscal autonomy পেলেই খুসী হবেন; যাঁর ঘরে পাসকরা ছেলে আছে তিনি Indianisation of Services, বড় বড় চাকরী পেলেই দল

থেকে সরে' পড়বেন। কিন্তু এই কুলি মজুর চাষার দলের পুঁটুলি নেই। লড়বার মত একটা আদর্শ আর একজোট হয়ে কাজ করবার শক্তি যদি এরা পায়, তা'হলে এরা অসাধ্য সাধন করবে; এরাই শেষ পর্য্যন্ত টিঁকে থাকবে।

যাঁরা সত্যি সত্যিই দেশের স্বাধীনতা চান, তাঁদের কাজ বড় বড় পাণ্ডাদের দিকে চেয়ে থাকা নয়, কাউন্সিলে বক্তৃতা শুনে হাততালি দেওয়া নয়; সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স কমিটির মীমাংসার জন্যে হাঁ করে' বসে' থাকাও নয়। তাঁদের কাজ এই শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করে' তোলা। তাদের পরিশ্রমের উপর সবাকারই অন্ন, বস্ত্র, আরাম নির্ভর করছে এই কথা তাদের বুঝিয়ে দেওয়া; আর তারা যাতে এই অন্ন, বস্ত্র আর আরামের যথেষ্ট ভাগ পায় তার ব্যবস্থা করা। এই ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে দেশের স্বাধীনতা আপনিই এসে পড়বে। কেননা তখন একদিকে দাঁড়াবে বিদেশী আর স্বদেশী মোড়লের দল, আর অপরদিকে দাঁড়াবে নিঃসম্বল বুদ্ধিজীবী আর শ্রমিকের দল। এই শেষের দল গড়ে' তোলার উপরই দেশের স্বাধীনতা নির্ভর করছে।

৮ই কার্ত্তিক, ১৩২৯

পার ত, এস

যাদের কাজকর্ম্ম বিশেষ-কিছু নেই তাঁরা বসে' বসে' খুড়োর গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করে। আমাদের খবরের কাগজওয়ালাদের হয়েছে তাই। এতদিন যা হবার তা'ত হলো ; কিন্তু এর পরে যে কি করতে হবে সে-বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা কারোর নেই। কেউ বলছেন—"কিছু করতে হবে না, কর্ত্তা যে রাস্তা বাৎলে দিয়ে গেলেন সেইখানে চুপটি করে' বসে' থাকো ; দেখবে স্বরাজের রথ এসে একেবারে গড় গড় করে' দেশকে স্বর্গে তুলে' নিয়ে যাবে। সুধু চাই একান্ত শ্রদ্ধা ; আর চুপ করে' বসে' থাকবার অসীম ধৈর্য্য।" আর-একদল বলছেন—"ভাল রে ভাল! তোমরা যা করছ তা করো না। কিন্তু কতকগুলো গবারাম যে দেশের প্রতিনিধি সেজে কাউন্সিলে গিয়ে লোক হাসাচ্চে, এটা ত আর সহ্য করা যায় না। কাউন্সিলে ঢুকে আর-কিছু করতে না পারা যায়, হৈ চৈ করে' ওটা ভেঙ্গে ত দেওয়া যায়—তাই বা কোন্ কম লাভ ?" প্রথম দল বলছেন—"এখন ভেঙ্গে দেবার নাম করে' ঢুকতে যাচ্ছ, কিন্তু ওখানে গেলেই তোমাদের জাত যাবে ; হাতে একটু ক্ষমতা পেলেই সবাই নিজের কোলে ঝোল টানতে আরম্ভ

করবে ; আর কর্ত্তারা আর-এক-কিস্তি রিফর্ম্ম দিলেই সবাই মডারেটদের মত পান্তাভাত হয়ে যাবে।"

সারা দেশময় খবরের কাগজে ঐ এক সুর উঠেছে—"কাউন্সিলে যাবো না।" আমরা বলি—"বাপু সকল, যাবে কি যাবে না—মিছে এ ভাবনা, বৃথা মর লোকলাজে।—তোমরা যাবেই।"

এ ঝগড়া আজকের নয়, বহুদিনের। মহাত্মা গান্ধী যতদিন বাইরে ছিলেন, দেশে যখন নিত্য-নূতন উত্তেজনার সৃষ্টি হচ্ছিল, তখন মহাত্মার প্রভাবে এ-কথাটা চাপা পড়েছিল মাত্র। যে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন মতের লোককে তিনি এক জায়গায় আটকে রেখেছিলেন, আজ তাঁর অভাবে তারা যে ভিন্ন ভিন্ন দিকে ছটকে পড়বে, এ ত জানা কথা! বেশ লক্ষ্য করে' দেখবার জিনিষ যে যাঁরা কাউন্সিলে গিয়ে ভারত-উদ্ধার করতে চান, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই উকিল, ব্যারিষ্টার, না-হয় পয়সাওয়ালা লোক। মুখে তাঁরা যাই বলুন না কেন, ইংরেজের বদলে তাঁরা যদি দেশকে শাসন করবার ক্ষমতা পান, তা'হলে তাঁরা (Dominion Self Government) উপনিবেশের মত স্বায়ত্ত-শাসন বা ঐ রকমের একটা-কিছু নিয়েই তুষ্ট হয়ে থাকবেন। দেশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে গেলে যত কাঠ-খড় পোড়াবার দরকার তা ভাবলেই তাঁরা আঁতকে ওঠেন। সুতরাং ইংরেজের সঙ্গে তাঁদের আপাততঃ যে বিরোধ সেটা প্রণয়ের বিরোধ। দুদিন পরেই মিলন হয়ে যাবে। আজ না-হয় কাল, তাঁরা দড়ি ছিঁড়ে পালাবেন।

যাঁরা খাঁটি অসহযোগী তাঁরা প্রধানতঃ গরীব আর মধ্যবিত্ত

শ্রেণীর লোক। সুধু তত্ত্বকথা আর চরকা আশ্রয় করে' তাঁরা যদি এখনকার মত বসে' থাকতে চান তা'হলে তাঁদের লোপ পেয়ে যাওয়া অনিবার্য্য। জনসাধারণের ক্রুদ্ধ নয়ন দেখে তাঁরা যদি সুধু মালা জপবার ব্যবস্থা দেন, তা'হলে একুল-ওকুল দুকুল নষ্ট হবে। এইটুকু তাঁদের আজ বেশ করে' বোঝা দরকার যে, দেশকে স্বাধীন করতে গেলে যে-শক্তির প্রয়োজন তা তাঁদের আপাততঃ নেই, আর সুধু বচনের দ্বারা সে-শক্তি সংগ্রহ করা যায় না। দেশের জনসাধারণ তাঁদের কাছে আশ্রয় নিতে এসেছিল, কিন্তু তাঁরা বুদ্ধির দোষে তাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা নিজের নিজের খেয়াল নিয়েই ব্যস্ত, দেশের লোকের মনের ভাব বোঝবার তাঁদের সময় হয়নি।

কিন্তু আজ অসহযোগ আন্দোলনকে যদি যথার্থই স্বাধীনতার আন্দোলন করে' তুলতে হয়, তা'হলে আর কুলি-মজুর চাষা-ভূষোকে বাদ দিলে চলবে না। যাঁরা কাউন্সিলে গিয়ে লড়াই করতে চান, তাঁরা যান; যতদিন তাঁরা কংগ্রেসের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে পারেন তা থাকুন। তাঁদের উপর বেশী ভরসা করলে চলবে না। আসল কাজ কাউন্সিলের বাইরে; কুলি-মজুর চাষা-ভূষোর মধ্যে।

তাদের বোঝাতে হবে যে তারাই দেশের প্রাণ; তাদের দেখিয়ে দিতে হবে যে সংঘবদ্ধ হলে তারা সব করতে পারে। তারা যে সমস্ত দিন খেটে অনাহারে মরবে এটা বিধির বিধান নয়; এটা একেবারেই মানুষের বিধান। আর তারা সংঘবদ্ধ হয়ে চেষ্টা করলেই এ বিধান উল্টে দিতে পারে। তাদের মধ্যে আশা গজিয়ে দিতে হবে; তাদের শক্তির আস্বাদ দিতে হবে। তাদের মাথায়

উপর যে যুগ-যুগান্তরের পুঞ্জীকৃত অত্যাচার চেপে রয়েছে অসহ-যোগীদের কাজ সেইটে সরিয়ে দেওয়া। ভদ্রতার মোহ ভুলে তাদের সঙ্গে গিয়ে মিলতে পারবে? তাদের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে পারবে? ভারতকে স্বাধীন করবার ঐ একমাত্র রাস্তা। কাউন্সিল-ফাউন্সিল ও-সব বাজে কথা।

১৫ই কার্ত্তিক, ১৩২৯
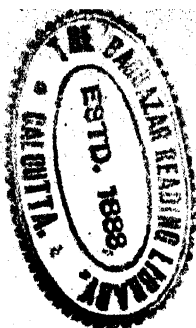
আমাদের কাঁঠাল, তোমাদের মাথা

কাউন্সিলে যাওয়া-না-যাওয়া ব্যাপারটাকে এত বড় করে' দেখা হচ্ছে যে, গোড়ার কথাটা চাপা পড়ে' যাবার যোগাড় হয়েছে। প্যাটেল প্রভৃতি যাঁরা কাউন্সিলে যাবার পক্ষপাতী তাঁরা বলছেন যে কাউন্সিলে যদি এখন ঢুকে ওটার দফারফা না করা যায় তা'হলে ওটা ক্রমে এত প্রবল হয়ে উঠবে যে দেশের লোকের মন ঐদিকে যাবে। দেশকে স্বাধীনতার জন্যে প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে চরকা ছাড়া যদি আর-কিছুর ব্যবস্থা না করা হয় তা'হলে ক্রমশঃ কাউন্সিল যে প্রবল হয়ে উঠবে তা বলাই বাহুল্য। লোকে মুখে যতই হুঁ দিক, মনে মনে ঠিক বোঝে যে সুধু চরকা কেটে খদ্দর হতে পারে, কিন্তু দেশের স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। অথচ কাউন্সিলে গিয়েও যে বিশেষ একটা হাতী-ঘোড়া লাভ হবে সে আশাও তাদের নেই। কাউন্সিলে গিয়ে কাউন্সিল ভাঙ্গা যেতে পারে কি না সেটাও সন্দেহের বিষয়। যদি ধরেই নেওয়া যায় যে কাউন্সিল ভেঙ্গে গেল—তারপর করবে কি? কাউন্সিল ভেঙ্গে দেবার পরই যে সরকার বাহাদুর জোড় হস্ত হয়ে বলবে—'বাপু, তোমাদের দেশ তোমাদের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি'—তার কোনো আশা নেই। সেদিন দেশের

একজন নামজাদা নেতা আমাদের বোঝাচ্ছিলেন যে, দেশ-বিদেশে দেশকাল যে-রকম পড়েছে তাতে প্রজার মতের বিরুদ্ধে কর্ত্তারা আর রাজ্য চালাতে সাহস করবেন না। আমাদের নেতাদের মনের কোণে যে কর্ত্তাদের উপর বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা এখনও গজ্ গজ্ করছে তা বেশ বুঝতে পারলুম। কিন্তু ইংরেজ অত কাঁচা ছেলে নয়। ফাঁকা আওয়াজে সে ভয় পায় না। আর দেশ-বিদেশের লোক আমাদের দুঃখের কথা বেশ জানতে পারলেই যে তাড়াতাড়ি নিজেদের কাজ-কর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে আমাদের সাহায্য করবার জন্যে ছুটে আসবে তা মনে করবার কোনো কারণ ত দেখিনে। আয়র্লণ্ডের দুঃখের কথা ত সবাই জানে। কে তার জন্যে ঢাল-তলোয়ার নিয়ে ছুটে এসেছে? মিশরের কথা জানতে ত কারো বাকি নেই। তার জন্যে কে মাথা ঘামাচ্ছে? পরের সাহায্যের আশায় যাঁরা কাউন্সিলে গিয়ে ফাঁকা তোপ দাগতে থাকবেন, ভবিষ্যতে তাঁদের হয় মডারেটদের দলে ভিড়ে যেতে হবে, নয়ত চুপ করে' পড়ে' থাকতে হবে।

যাঁরা কাউন্সিলে যাবার বিরুদ্ধে তারস্বরে প্রতিবাদ করছেন, তাঁরাও ত আসল কাজের দিকে মন দিচ্ছেন না। তাঁদের কথা শুনলে মনে হয় যেন কাউন্সিলে যাওয়াটা বন্ধ করতে পারলেই দেশের যা-হোক একটা সদ্গতি হয়ে যাবে। কিন্তু এতদিন তাঁরা থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড় করে' কাটালেন কেন? তাঁরা যদি দেশের লোককে সিভিল ডিসোবিডিয়েন্সের জন্যে প্রস্তুত করতে চান, তা'হলে তার আয়োজন কি করেছেন? তাঁরা বলছেন—"দেশের

লোককে ত এত করে' খদ্দর বুনতে বলছি, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রীতিস্থাপনের জন্যে এত সদুপদেশ শোনাচ্ছি—আবার কি করবো! দেশের লোক যদি আমাদের কথা না শোনে ত আমাদের দোষ কি ?"

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স করবার এটাই প্রকৃষ্ট রাস্তা এ কথাটা মেনে নেবার আগে একটু ভেবেছ কি? দেশের লোক যে তোমাদের কথা শুনছে না এটা কি সত্যিই দেশের লোকের দোষ? তোমরা যখন চৌকিদারী ট্যাক্স, নুণের ট্যাক্স বন্ধ করে' দেবার কথা বলেছিলে তখন ত দেশের লোক তোমাদের কথা বেশ শুনেছিল! তারপর তোমরা যেদিন চৌরিচৌরার দৃশ্য দেখে চিৎপাত হয়ে পড়লে, সেদিন দেশের লোক বুঝলে যে তোমরা সুধু বচনের বাঘ, কাজের কেউ নও। তোমরা বললে—'দেশের লোক মানুক আর নাই মানুক, আমরা যে দাওয়াই বাৎলে দিচ্ছি, তাই শাস্ত্রসঙ্গত, তাইতেই রোগ সারা উচিত।' কিন্তু শাস্ত্রসম্মতিক্রমে বললেও চলবে না, বা, রোগ সারা উচিত বললেও চলবে না। রোগ যে সারল না তা চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। আসল কথা তোমরা রোগ ঠিক করতেই পারনি।

সত্যি কথা হচ্ছে এই যে, তোমরা নিজেদের যত বড় করে' দেখচ, তোমরা তত বড় নও। তোমরা ঠিক করেছিলে যে কলেজ, আদালত, উপাধি আর কাউন্সিল এই চারটে হচ্ছে ইংরেজ রাজত্বের খুঁটো; আর এই চারটে সরিয়ে নিতে পারলেই ইংরেজ রাজত্ব হুড়মুড় করে' পড়ে' যাবে। কিন্তু একটু চক্ষু চেয়ে যদি দেখ ত

দেখতে পাবে যে ইংরেজ রাজত্বের শিকড় আরও অনেক দূর পর্য্যন্ত গজিয়েছে। ইংরেজ এদেশে ব্যবসা করতে এসেছিল আর ব্যবসার বিস্তারের জন্যেই রাজ্য গড়ে' তুলেছে। এদেশে কলকারখানা বানিয়ে, ব্যবসায় চালিয়ে যতদিন ইংরেজের লাভের সম্ভাবনা থাকবে ততদিন ইংরেজের প্রভুত্বও বজায় থাকবে। সেই লাভের টাকা সৃষ্টি করে কে? যারা মাঠে চাষ করে' ইংরেজের জন্যে কাঁচামাল তৈরী করে, যারা কুলি-মজুর হয়ে ইংরেজের কলে খাটে, তারাই ইংরেজের রাজত্বের ভিত্তি। তাদের খাটিয়ে টাকা করবার জন্যেই ইংরেজের এদেশে রাজত্ব করা।

আর তোমরা? তোমরা যারা ইংরেজী শিখে মনে করেছ তোমরাই দেশের সর্ব্বস্ব, যারা উপাধি নিয়ে রায় বাহাদুর হয়েছ, যারা আদালতে গিয়ে ওকালতি করছ, যারা কাউন্সিলে গিয়ে বক্তৃতা করছ, যারা কলেজে পড়ে' চাকরীর জন্যে দরখাস্ত হাতে করে' অফিসের দরজার কাছে ঘুরে' ঘুরে' বেড়াচ্চ, তোমরা ইংরেজকে টাকা রোজকার করবার জন্যে একটু সাহায্য কর মাত্র। তোমরা দেশের অর্থ সৃষ্টি কর না; ইংরেজের সাহায্য করে' সুধু খানিকটা অর্থের উপর ভাগ বসাও মাত্র। ইংরেজ তোমাদের একটু সাহায্য নিয়ে রাজ্য চালায়; কেননা তাতে খরচ একটু কম পড়ে। কিন্তু তা বলে' ভেবো না যে তোমরা সরে' দাঁড়ালে এ রাজ্য ভেঙ্গে পড়বে। তোমাদের বয়কটের গোড়ায় গলদ ঐখানে।

যারা সত্যি সত্যি অসহযোগ করলে ইংরেজের রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে তারা মাঠের চাষা, কলের মজুর। তোমাদের কথায় উদ্বুদ্ধ

হয়ে তারা যেদিন নিজেদের পাওনাগণ্ডা বুঝে পাবার জন্যে রুখে দাঁড়াল, সেদিন তোমরাও নিজেদের সর্ব্বনাশ হবে ভেবে ভয়ে আঁতকে উঠলে। তাড়াতাড়ি বলে' পাঠালে—'জমিদারের খাজনা এখনি দিয়ে দাও, চৌকিদারী ট্যাক্স, নুণের ট্যাক্স এখনি দাও।' তোমাদের সঙ্গে কুলি মজুর চাষার স্বার্থ যে এক নয়, সে কথা তারা সেইদিন বুঝতে পেরেছে, সেইদিন তারা টের পেয়েছে যে তোমরা ইংরেজের ছোট ভাই। তোমাদের আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথার দর যে কি, তা বুঝতে তাদের আর বাকি নেই। আজ তোমরা প্রজার রক্ত চুষে জমিদার হয়েছ, মক্কেলের প্রাণবধ করে' ব্যারিষ্টার হয়েছ, কলেজে এম্-এ পাশ করে' বিয়ের বাজার গরম করে' তুলেছ, আর টাকার থলি আঁকড়ে বক্তৃতা দিয়ে বলছ—"হে দেশবাসিগণ, ইংরেজকে তাড়িয়ে, আমাদের সিংহাসনে বসিয়ে দাও। তারি নাম স্বরাজ। এই স্বরাজ হলে দেশের দুঃখ আর থাকবে না।" কিন্তু দেশের নিরন্ন, অস্পৃশ্য, রুগ্ন লোকগুলো যখন তোমাদের জিজ্ঞাসা করে—'বাবুরা তোমাদের টাকার থলির কতখানি আমাদের জন্যে খালি করবে, তোমাদের স্বরাজে আমাদের ব্যবস্থা কি রকম হবে?'—তখন তোমরা পরম ধার্ম্মিক সেজে বলো—'বাপু-সকল, টাকার থলির দিকে দৃষ্টি কোরো না, লোভ বড় খারাপ জিনিষ। তোমরা নিষ্কামভাবে স্বার্থত্যাগ করতে শেখ, ষড় রিপু দমন করো। আমাদের কথামত পড়ে' পড়ে' মার খাও, আর অহিংসা অভ্যাস করো। আমাদের কাঁঠাল আর তোমাদের মাথা, এ দুটো মিশিয়ে, এসো অপার্থিব স্বরাজের সৃষ্টি করি।'

কিন্তু দাদাসকল এ চালাকি চলবে না। যদি সত্যি সত্যিই দেশের স্বাধীনতা চাও, তা'হলে এই কথাটি আগে বোঝ যে দুচারজন ভদ্রলোক মিলে তা নিতে পারবে না—তা কাউন্সিলে গিয়ে বক্তৃতাই দাও, আর ঘরে বসে' চরকাই কাট। দেশের লোকের সঙ্গে সমান হয়ে যদি মিশতে পার, তাদের সঙ্গে সমান অধিকারে যদি তুষ্ট হও, ত কোমর বেঁধে দাঁড়াও। দেখবে দেশ তোমার আগেই প্রস্তুত হয়ে আছে। দেশ প্রস্তুত নয়, এটা মিছে কথা, প্রস্তুত নও স্নধু তোমরা—কেননা তোমরা নিজের নিজের পুঁটুলির মায়া আজও কাটাতে পারনি।

২৯এ কার্ত্তিক, ১৩২৯

কেন হয় না?

নাগপুরের কংগ্রেসে একটা প্রস্তাব পাশ হয়েছিল যে সারা দেশময় শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করে' তুলতে হবে। কিন্তু পাশ হবার পরেই প্রস্তাবটা সেই যে পাশ হয়ে শুয়েছিল এতদিন পর্য্যন্ত আর নড়ে চড়ে নি। এইবার আবার সেইটাকে টেনে খাড়া করা হয়েছে; সেইমত নাকি কাজ আরম্ভ করা হবে।

হয়নি কেন? তার সোজা উত্তর এই যে কুলি-মজুরদের দুঃখ আমাদের গায়ে লাগে না। ওরা না জানে দুটো ইংরেজীতে কথা বলতে, না জানে দাঁড়িয়ে দুটো বক্তৃতা করতে। সুতরাং ওদের আমরা মানুষের মধ্যেই গণ্য করিনে, নিতান্ত দায়ে না ঠেকলে ওদের কাছে ঘেঁষিনে।

কৃষকদের সম্বন্ধেও ঐ এক কথা। ছেলেবেলা থেকে যে শুনে আসছি—'ও বেটা চাষা'—সেই কথা শুনতে শুনতে আমাদের মনের মধ্যে এ কথাটা একেবারে গেঁথে গেছে যে চাষাগুলো একদম বাজে মাল। ওরা রাজনীতির বোঝেই বা কি, আর আমাদের বড় বড় আন্দোলনে ওরা সহায় হবেই বা কেমন করে'? ওরা না পড়েছে বার্ক, না পড়েছে মর্লি! ওদের নিয়ে কি আর কাজ করা চলে?

ঐখানেই আমাদের সব আন্দোলনের সর্ব্বনাশ হয়েছে। মুখে যতই বকি না কেন, কাজকর্ম্ম দেখে মনে হয় যে এবিষয়ে মডারেট আর অসহযোগীতে খুব বেশী তফাৎ নেই। মডারেটরা দেশের নাম করে' যখন বড় বড় বক্তৃতা দিতেন, তখন দেশ বলতে তাঁরা নিজেদের মত জনকয়েককে ছাড়া আর বেশী কিছু বুঝতেন না। সে কথা তাঁদের আমলের কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলো পড়লেই বেশ বুঝতে পারা যায়। রিফর্ম্ম বিলের সঙ্গে সঙ্গে যখন তাঁদের পেটে ছিটেফোঁটা কিঞ্চিৎ গিয়ে পড়লো তখন তাঁরা ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন। পেটভরার সঙ্গে সঙ্গে মুখও বন্ধ হয়ে এল।

মডারেটদের ঠিক পরে আসরে নেমেছিলেন বিপ্লবপন্থীরা। ঠিক আসরে নেমেছিলেন বললে ভুল হবে—তাঁরা ইন্দ্রজিতের মত মেঘের আড়াল থেকেই বাণবর্ষণ করতেন। তাঁদের বিপ্লবের চেষ্টা যে ব্যর্থ হয়েছিল, তার কারণ এই যে সে বিপ্লব-চেষ্টার পিছনে জনকতক ভদ্রলোকের ছেলে ছাড়া আর-কেউ ছিল না। মডারেটরা ভাবতেন,—'ছোঁড়াগুলো লাঠালাঠি করে' মরুক ; যদি কিঞ্চিৎ লাভ হয় ত সেটা আমাদের ভাগ্যেই এসে পড়বে।' আজকাল যাঁরা মডারেটদের পাণ্ডা তাঁরাও তখন এই বিপ্লবপন্থীদের দূর থেকে টাকাটা-সিকেটা দিয়ে সাহায্য করতেন ; মনে মনে ভাবতেন—'দেখাই যাক্ না ছোঁড়ারা কত দূর কি করতে পারে !' দেশের সাধারণ লোকে ব্যাপারটা বিশেষ কিছু বুঝতো না। তারা হাঁ করে' ভাবতো—'এ আবার কি উৎপাত।' আর বিপ্লবপন্থীরা স্থধু মরতেই শিখেছিল ; দেশের লোককে কি করে' দলে আনতে

হয়, তা আর শেখেনি। তাই দেশের লোক জাগবার আগেই তারা মরে’ গেল।

তারপর অসহযোগীদের পালা। এঁরা যাকে কাজের প্রোগ্রাম বলে’ খাড়া করেছেন তার মধ্যে ঐ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকের স্থান যতখানি, দেশের সাধারণ লোকের স্থান ততখানি নেই। গোড়ায় দেখ বয়কটের কথা। উপাধি ত্যাগ কর, কাউন্সিল ত্যাগ কর, স্কুল-কলেজ ত্যাগ কর, আইন-আদালত ত্যাগ কর। তাতেই নাকি বিদেশীর রাজ্য টলে’ যাবে! ভাল; দেশের শতকরা আশীজন যে গরীব দুঃখী, যারা চাষ করে বা মজুরী করে’ খায়, তাদের এ প্রোগ্রামে স্থান কোথায়? তাদের ত উপাধির ব্যাধিও নেই, তারা স্কুল-কলেজেও পড়ে না, সামলা মাথায় দিয়ে আদালতে ওকালতি করতেও যায় না, বা কাউন্সিলে গিয়ে বক্তৃতাও করে না। তারা দেশের জন্যে কি করবে? তাদের কথা আমাদের মনেই আসেনি। মডারেট আর বিপ্লবপন্থীদের মত অসহযোগীরাও ভেবেছিলেন যে দেশের অন্ততঃ বার আনা লোককে বাদ দিয়ে তাঁরা ইংরেজ রাজত্বের চারটে খুঁটো সরিয়ে নিয়ে কাজ হাসিল করবেন।

কিন্তু তা হলো না। যারা পেটের জ্বালায় ক্ষেপে উঠেছিল, তারা চৌরিচৌরায় আগুনের অক্ষরে অসহযোগের উপরে লিখে দিলে—‘আমরা এখনো বেঁচে আছি; আমাদের বাদ দিয়ে চলবে না।’

Constructive programme আরম্ভ হলো। দেশকে অহিংস করে’ তুলতে হবে! অতএব তাদের প্রেমতত্ত্ব বোঝাও,

আধ্যাত্মিক উপদেশ দাও, খদ্দর পরাও। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রীতি নিয়ে এস ; ছুঁৎমার্গ তুলে' দাও ; তাদের লেখাপড়া শেখাও। খুব ভালো কথা। কিন্তু ঐ গোড়ার কথাটা যে চাপা পড়ে' গেল। তারা সমস্ত দিন লাঙ্গল চষে' যে ধান-চাল জন্মায়, তার ভাগ যে তারা নিজে পায় না, সবই যে জমিদার রাজা আর মহাজনে ভাগ করে' নেয়। তারা দিনে দশ-বার ঘণ্টা মজুরী করে' যে পয়সা পায় তাতে যে তাদের কুঁড়েঘরের মটকা ছাওয়া চলে না, শীতের সময় যে তাদের হি হি করে' কাঁপতে হয়। তাদের বাচ্ছা-কাচ্চা যে না খেতে পেয়ে তাদের চোখের সামনে মরে' যায়। খদ্দর খুব ভালো কথা, কিন্তু সুধু খদ্দরে কি সে-দুঃখ ঘুচবে ?

ত্যাগ স্বীকার করতে হবে ? হায়রে ত্যাগ ! সৃষ্টির আদি থেকে আজ পর্য্যন্ত যে তারা সুধু ত্যাগ করেই এসেছে। কই তাদের দুঃখ ত ঘোচেনি ; কি আছে তাদের যে ত্যাগ করবে ? মোটরে চড়ে' ত্যাগধর্ম্ম প্রচার করে' বেড়ান তোমাদের সাজে, কিন্তু গরীবের তাতে পেট ভরে না। পেটের জ্বালা যে কি, তা তোমরা জান না ; তাই তোমাদের প্রেমতত্ত্ব অতি ঠুনকো জিনিষ। তোমাদের আধ্যাত্মিকতা সুধু বৈঠকী ব্যাপার। আর সেইজন্যেই আজ পর্য্যন্ত দেশের জনসাধারণ তোমাদের দলে এসে যোগ দেয়নি। তাদের অভাবে আজ তোমাদের সিভিল ডিসোবিডিয়েন্সের আশা ছেড়ে দিয়ে আবার কাউন্সিলের কথা তুলতে হচ্চে। অথবা মহাত্মা গান্ধীর ফিরে না আসা পর্য্যন্ত মালাজপ করবার প্রস্তাব হচ্চে।

আজ যে আর হালে পানি পাচ্ছ না, তার মানে সুধু এই যে কেবল ভদ্রলোকের দল নিয়ে দেশ-উদ্ধার করা চলে না। যতই বড় বড় তত্ত্বকথা শোনাও, আর যতই লম্বা লম্বা বক্তৃতা ঝাড়, যত দিন কংগ্রেস সুধু আড়াইজন ভদ্রলোকের কাকসভা হয়ে থাকবে, ততদিন কংগ্রেস ঘুরে-ফিরে ঐ কাউন্সিলে গিয়ে বচনের স্বরাজ গড়তে চাইবে। দেশের লোকের শক্তির উপর নির্ভর করে' যদি স্বরাজ গড়তে চাও, তা'হলে অন্য রাস্তা ধরতে হবে। দেশের চাষা-ভূষো, কুলি-মজুর, দীন-দুঃখীর নেতা হয়ে যদি দাঁড়াতে পার—তা'হলে আর বারদৌলী অনুশাসনের মাপকাটি দিয়ে দেশের উন্নতির মাত্রা মেপে মেপে দিন গুণতে হবে না। অষ্টবজ্র একত্র হয়ে তোমার পথের বাধা জ্বালিয়ে দেবে। আর মহাকালীর পূজা না দিয়ে যদি সুধু ব্যোম ভোলানাথকে আলোচাল আর কাঁচকলা দিয়ে ভোলাতে চাও, তা'হলে তোমাদের অদৃষ্টেও ঐ কাঁচকলা।

৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৯

একমাত্র উপায়

সারা দেশে খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে' দিয়ে, সব আইন ভঙ্গ করে' স্বাধীনতা পাবার চেষ্টা করাই যদি কংগ্রেসের লক্ষ্য হয়, তা'হলে এখন যে ভাবে কাজ চলছে তা করলে হবে না। Constructive programmeটা খুব ভালো জিনিষ। চরকা কাট, খদ্দর পর, সালিসী আদালত বসিয়ে মামলা-মোকদ্দমা মেটাও, অস্পৃশ্যদের স্পর্শ করে' জাতে তোল, হিন্দু-মুসলমানে সদ্ভাব স্থাপন কর—এ তো বেশ কথা, এতে তো কেউ আপত্তি করছে না। কিন্তু কথা হচ্ছে এ সবের সঙ্গে সিভিল ডিসোবিড়িয়েন্সের ঠিক সম্বন্ধটা কি? এ ব্যাপারের ত সবটাই সিভিল; কিন্তু এর সঙ্গে ডিসোবিডিয়েন্সের যে কোনো সম্পর্ক আছে তা ত নজরে পড়ে না। তাই সেকালের স্বদেশী-যুগে যা হয়েছিল, এবারেও ঠিক তাই হচ্ছে। অর্থাৎ পুলিশের গুঁতোয় চরকা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্চে। খদ্দরের উপর কর্ত্তাদের যে বেশ সুদৃষ্টি নেই, তা যাঁরা পাড়াগাঁয়ে চরকা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন তাঁরাই জানেন। দশ বছর কি বিশ বছর পরে এই চরকা থেকে স্বরাজ বেরিয়ে আসবে এই আশায় লোকে চুপ করে' সব অত্যাচার সইতে পারে না। তাই তারা হাল ছেড়ে দিয়ে চুপ করে' বসে' পড়ে।

একদল বলছেন এই সমস্ত কাজের সঙ্গে সঙ্গে কাউন্সিলে যাওয়ার ব্যবস্থা কর। সেইখানে গিয়ে হট্টগোল বাধাতে পারলে কর্ত্তারা আমাদের সঙ্গে একটা রফা করতে বাধ্য হবে, আর রফা যদি না-ও করে আমরা সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স লাগিয়ে দেবো। কিন্তু আমরা লাগিয়ে দেবো বললেই কি সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স লেগে যাবে? আমরা নাকি কাউন্সিলে গিয়ে বলবো—খেলাফতের একটা ব্যবস্থা করো, পাঞ্জাবের ডায়ারী আমলের অত্যাচারের একটা সুবিচার করো, আর আমাদের স্বরাজ দাও। খেলাফতের ব্যবস্থার জন্যে কাউন্সিলে যাবার বিশেষ কোনো স্বার্থকতা আছে বলে' মনে হয় না, আর তা ছাড়া কামাল পাশা লাঠির চোটে তার যা হয় একটা ব্যবস্থা করে' নিচ্চে। কামাল পাশাকে সাহায্য করতে পারলেই খেলাফতের সাহায্য করা হয়। 'ডায়ারী' আমলের পাঞ্জাবী দুঃখ নিয়ে এখনও নাড়াচাড়া করা সুধু একটা বাঁধা বুলি আওড়ান। তারপরে অনেক দুঃখ পাঞ্জাবের উপর দিয়ে আর দেশের অন্যান্য জায়গার উপর দিয়ে চলে' গেছে। দেশ স্বাধীন না হলেও সমস্ত দুঃখের শান্তি হয় না। সুতরাং আসল কথা হচ্চে স্বরাজ পাওয়া, আর আপাততঃ ঠিক হয়েছে যে সমস্ত খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে' দিয়ে শাসনযন্ত্র অচল করে' দেওয়া স্বরাজ পাবার উপায়।

কিন্তু দু-দশজন লেখাপড়াজানা ভদ্রলোক মিলে খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করলে ত রাজ্য অচল হয়ে পড়বে না; দেশের সকলকে মিলে, অন্ততঃ অধিকাংশকে মিলে খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে' দিয়ে

মরিয়া হয়ে দাঁড়াতে হবে। 'স্বরাজ' ব্যাপারটা যে কি তা এ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের কর্ত্তারা স্পষ্ট করে' বলেননি। এ রকম একটা অনির্দ্দিষ্ট, অস্পষ্ট ব্যাপারের জন্যে জনসাধারণ যে বড় বেশী কষ্ট স্বীকার করতে রাজী হবে, তা মনে হয় না। তারা জানতে চাইবে যে স্বরাজ পেলে তাদের দুঃখ ঘুচবে কি না। তাদের পেটের ভাত আর কোমরে যাতে কাপড় জোটে তার কোনো ব্যবস্থা হবে কি না। তা যদি হয় ত তারা লড়ায়ের দুঃখ-কষ্ট মাথায় করে' নিতে রাজী হবে। আর তা যদি না হয় ত বাবুভায়ারা স্বরাজ পেলেন কি না-পেলেন তা তাদের বয়ে গেল।

সারা ভারতবর্ষের কথা ছেড়ে দিয়ে সুধু বাংলাদেশের কথাই ধরা যাক। এখানকার শতকরা পঁচাত্তর জন চাষী; সুতরাং এখানে দেশজোড়া সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স আরম্ভ করতে গেলে সুধু স্বরাজের বাঁধা বুলি আওড়ালে চলবে না; দেখতে হবে এই চাষীদের যথার্থ দুঃখ কি, আর কোন্ দুঃখ ঘোচাবার আশায় তারা প্রাণপণে লড়বে।

সোজাসুজি দেখলে দেখতে পাওয়া যায় যে জমীদার আর পুলিশের অত্যাচারে তারা দিনে দিনে মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। 'বিজলী'তে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন, "বাংলা দেশের যা-কিছু ধন, তা মাটী চষে বাংলার চাষী প্রতি বৎসর উৎপন্ন করে। আমরা আর-সবাই কিছু বদল দিয়ে বা না-দিয়ে তার ভাগ নিই। ভাগ-বাটোয়ারার পর যা অবশিষ্ট থাকে তাতে চাষী দুবেলা পেটপুরে খেতে পায় না। এ অবস্থায় চাষের জমিতে

চাষীর স্বত্বই যে আর-সবার স্বত্বের চেয়ে বাড়ানো দরকার তা চোখে স্বার্থের ছানি না থাকলে দেখতে কিছুই কষ্ট হয় না।"

চাষের জমির উপর চাষীদের স্বত্ব যদি স্বরাজের অঙ্গীভূত হয় তা'হলে চাষীরা সবাই স্বরাজ পাবার জন্যে লড়তে রাজী হবে; আর স্বরাজ যদি সুধু একটা ফাঁকা আওয়াজ হয় তা'হলে তার জন্যে এদেশে সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স কস্মিনকালেও হবে না।

যাঁরা কাউন্সিলে গিয়ে লড়াই করতে চান তাঁরা এই চাষীদের হয়ে লড়াই করতে রাজী আছেন? তাঁরা এ কথা বলতে রাজী আছেন যে চাষের জমি চাষীর সম্পত্তি বলে' স্থির করা হোক্? জমিদার সুধু উড়ে' এসে জুড়ে' বসেছে, তারা জমির কেউ নয়? তা বলতে যদি রাজী থাকেন, ত সমস্ত প্রজা তাঁদের পক্ষে এসে দাঁড়াবে; সবাই তাঁদের কথামত কাজ করতে প্রস্তুত হবে।

এখনকার কাউন্সিল জমিদার আর মহাজনে ভরা তা জানি; আর কাউন্সিলে গিয়ে আপাততঃ ও-রকম আইন পাশ করাও যে অসম্ভব তা জানি। কিন্তু দেশকে সিভিল ডিসোবিডিয়েন্সের জন্যে প্রস্তুত করবার জন্যে যাঁরা কাউন্সিলে যেতে চান তাঁদের সুধু মুখের কথায় নয়, সত্যি সত্যিই এই প্রজাদের প্রতিনিধি হয়ে দাড়াতে হবে। কাউন্সিলে গিয়ে প্রজার হয়ে তাঁদের বলতে হবে যে প্রজারা জমির উপর পূর্ণ স্বত্ব চায়; আর যখন কর্ত্তারা তাঁদের সে প্রস্তাব ছুঁড়ে ফেলে দেবে, তখন কাউন্সিলের বাইরে এসে প্রজাদের বলতে হবে—'এরা তোমাদের কথা শুনছে না, অতএব খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে' দিয়ে একবার আচ্ছা করে'

লেগে যাও।' হাওয়া খাবার জন্যে কাউন্সিলে গেলেও কিছু হবে না, আর ঘরে বসে' চরকা কাটলেও কিছু হবে না। প্রজাদের সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ান চাই, আর তাদের এমন আদর্শ দেখান চাই যা তারা সোজাসুজি বুঝতে পারে। সিভিল ডিসোবিডিয়েন্সের ঐ এক রাস্তা।

২৭এ অগ্রহায়ণ, ১৩২৯

খোল্‌-নলচে বদলাও

গয়ার কংগ্রেসে দলাদলিটা মিটে' যাবে কি পেকে উঠবে তাই নিয়ে চারিদিকে গবেষণা আরম্ভ হয়ে গেছে। যা নিয়ে দলাদলি দেখা দিয়েছে সেটা খুব বড় কথা নয়। কাউন্সিলে গিয়েই যে চতুর্ব্বর্গ লাভ হবে তার কোনো মানে নেই ; আর না গেলেই যে দেশের একটা গতি হয়ে যাবে তারও কোনো লক্ষণ দেখিনে। কংগ্রেসের যেটা গোড়ার কথা—দেশকে স্বাধীন করা—সেটা ক্রমশই চাপা পড়ে' যাচ্চে ; আর অসহযোগ আন্দোলনের ছাপান্ন রকম আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ব্যাখ্যা নিয়েই সবাই ব্যস্ত। যাঁরা কাউন্সিলে যাবার বিরোধী তাঁরা বলছেন, ওখানে গেলে অসহযোগ আন্দোলনের ধর্ম্ম নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের ধর্ম্ম বজায় রেখেও যে কেমন করে' স্বাধীনতা পাওয়া যাবে সে-সম্বন্ধে তাঁরা নীরব। চরকা চালাও, খদ্দর পর, আর জাতীয় বিদ্যালয় সম্বন্ধে কাগজে দু-একটা লিখো, না-হয় দু-একটা বক্তৃতা দিও ; তারপর স্বরাজ হওয়া ভগবানের হাত—এইটাই যেন তাঁদের মনোগত ভাব। কোনো রকম গোলমাল বা লড়ালড়ির দিকে তাঁরা যেতে চান না—ও-রকম করলে নাকি ভারতের সনাতন

ধর্ম্ম নষ্ট হয়ে যাবে! সনাতন ধর্ম্মটা যে এ রকম ক্ষণভঙ্গুর জিনিষ তা ত জানা ছিল না!

যাঁরা কাউন্সিল দখল করতে চাইছেন, তাঁদের কাউন্সিল ভাঙ্গবার দিকে যতটা দৃষ্টি, অন্য কোনো কাজের দিকে তেমন দৃষ্টি নেই। না-হয় ধরেই নেওয়া গেল যে কাউন্সিলে গিয়ে তাঁরা সরকার বাহাতুরের রসদ বন্ধ করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন; তখন কর্ত্তারা হয় ব্যতিব্যস্ত হয়ে কাউন্সিলওয়ালাদের সঙ্গে যা-হোক একটা রফা করে' ফেলবেন, না-হয় কাউন্সিল তুলে' দেবেন। রফাই যদি হয় তা'হলে এখন থেকে বুঝে রাখা ভালো যে রফার নাম স্বাধীনতা নয়। সে-রফার মানে রিফর্মের আর-এক-কিস্তি। এখনকার মডারেটরা যেমন রিফর্ম পেয়ে সরকারী দলভুক্ত হয়ে পড়েছেন, ভবিষ্যতে দ্বিতীয় কিস্তি রিফর্ম পেয়ে আবার একদল নতুন মডারেটের সৃষ্টি হবে। কিন্তু রফা হওয়া সম্বন্ধেও অনেক গোলমাল। গতবার যখন রিফর্ম বিলের খসড়া তৈরী হয়, তখন সরকার বাহাতুর ঘরে-বাইরে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন; রিফর্ম দেওয়া ছাড়া তাঁর আর গত্যন্তর ছিল না। সুধু আইনের প্যাঁচে ফেলে কর্ত্তাদের কাছ থেকে কিছু আদায় করে' নেবে এমন ছেলে এখনও জন্মায়নি।

তারপর যদি কর্ত্তারা কাউন্সিল তুলে' দিয়ে, মুখোস খুলে' ফেলে একেবারে দন্তবিচ্ছেদ করে' দাঁড়ান—তখনকার জন্যে কি ব্যবস্থা করছ? তখন কি দেশের লোকের কাছে গিয়ে বলবে—'ভাই-সকল, কর্ত্তারা আমাদের সঙ্গে রফা করলে না, অতএব তোমরা

খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে' দাও।' যাদের খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করবার জন্তে বলবে, তারা কি আশায় তোমাদের সঙ্গে এসে যোগ দেবে? কি তোমরা দেবে তাদের?

যাঁরা আধ্যাত্মিক অসহযোগী তাঁরা দেশের জনসাধারণকে খদ্দর পরবার উপদেশ দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন। কিন্তু খদ্দর পরলেই কি তাদের দুঃখ ঘুচবে? জমিদার, পুলিশ, মহাজনের হাতে পড়ে' যারা সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে ও হচ্ছে, খদ্দর পরলেই কি তাদের পেটের আর প্রাণের জ্বালা মিটবে?

যাঁরা কাউন্সিল ধ্বংস করতে চান, তাঁদের মধ্যে এক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ছাড়া আর-কাউকে কৃষকদের সম্বন্ধে কোনো কথা বলতে শুনিনে। শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করবার প্রস্তাব নাগপুর কংগ্রেসে পাশ হয়েছিল, কিন্তু তা ধামাচাপা পড়ে' আছে। কংগ্রেস ও-সম্বন্ধে কোনো চেষ্টা করেননি। কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ করবার প্রস্তাব দেশবন্ধুর কার্য্য-প্রণালীর মধ্যে 'বাঙলার কথা'য় দেখেছিলাম; কিন্তু কি উদ্দেশ্যে যে কৃষকদের বা শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে চেষ্টা করা হবে তা 'বাঙলার কথা'য় দেখিনি, অথচ আমাদের মনে হয় যে, সঙ্ঘ গড়া বড় কথা নয়; আসল কথা হচ্ছে কি উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করা হবে।

কংগ্রেসের কার্য্য-প্রণালী দেখলে মনে হয় ওটা সুধু সওদাগর, মহাজন, উকিল, ব্যারিষ্টার, প্রোফেসার আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলে-ছোকরাদের যাতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা হয় তাই নিয়ে ব্যস্ত। দেশের শাসনপ্রণালী যে রকম ভাবে বদলালে ঐ সব

শ্রেণীর কতকটা আর্থিক লাভ হয় বা প্রভুত্ব বাড়ে, সেইটাই যেন কংগ্রেসের আদর্শ। দেশের শতকরা আশীজন লোক যে এ সমস্ত শ্রেণীর বাইরে, সেটা কংগ্রেস দেখেও দেখেন না। দেশের পুরো স্বাধীনতা পেতে গেলে যে দেশের অধিকাংশ লোকের শক্তির প্রভাবে তা পেতে হবে, আর দেশের অধিকাংশ লোককে স্বাধীনতার জন্যে শক্তি প্রয়োগ করাতে হলে যে দেশের অধিকাংশ লোকের স্বার্থের দিক দিয়ে ব্যাপারটাকে দেখতে হবে—এ কথাটা কংগ্রেসের কর্ত্তারা বুঝেও বোঝেন না। দেশে কলওয়ালার সঙ্গে মজুরের এখন যা সম্বন্ধ তাই থাক, কংগ্রেসের কর্ত্তারা যে সব শ্রেণীভুক্ত সে সমস্ত শ্রেণীর স্বার্থ ষোল আনা বজায় থাক—কেবল মাঝ থেকে দেশের জনসাধারণ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে দেশকে বিদেশীর কবল থেকে মুক্ত করে' স্বদেশী পাণ্ডাদের হাতে তুলে' দিক! ওহে, তা হবে না—হবে না। কংগ্রেসের নল্‌চে, খোল—দুই বদলাতে হবে; তা যদি না কর, ত দেশকে স্বাধীন করা কংগ্রেসের কর্ম্ম নয়। কংগ্রেস চিরদিন 'ঘটত্ব' আর 'পটত্ব' নিয়েই মজে' থাকবে।

১২ই পৌষ, ১৩২৯

কংগ্রেসের কচকচি

কংগ্রেসে যে দুটি দল দেখা দিয়েছে, তাদের পরস্পরের মধ্যে মতের অমিল যতই থাকুক, এক জায়গায় বেশ পাকা মিল আছে। সেটা হচ্ছে এই যে, দুটি দলই দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দল।

পুরাণো দলের আশা ছিল যে কোর্ট, কাউন্সিল, উপাধি আর ইস্কুল-কলেজ ছেড়ে দিলেই ইংরেজ রাজত্ব ভেঙ্গে পড়বে। না পড়ে, তখন খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করবার আয়োজন করা যাবে। কিন্তু যে কারণেই হোক্, কোর্টও খালি হয়নি, কাউন্সিলও খালি হয়নি, কলেজও খালি হয়নি; আর উপাধিধারীর দলও বেঁচে আছে। খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করবার আয়োজন বারদোলিতে হয়েছিল; কিন্তু বোধন আরম্ভ হবার আগেই ঘট ফেঁসে গেল। খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করা চাপা পড়ে' গেল; আর শীঘ্র যে কোথাও আরম্ভ হবে সে-রকম লক্ষণ দেখা যাচ্চে না।

এবারকার কংগ্রেসে যে সমস্ত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে, তার মধ্যে ঐ সমস্ত মামুলি কোর্ট, কাউন্সিল, কলেজ বয়কট করার প্রস্তাব ত আছেই, অধিকন্তু আছে সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স আরম্ভ করার প্রস্তাব। কোর্ট, কাউন্সিল, কলেজ বয়কট করা

কার্য্যতঃ এ পর্য্যন্ত হয়ে ওঠেনি, আর ভবিষ্যতে হবার সম্ভাবনাও যে খুব কম, এ কথা কংগ্রেসের কর্ত্তারা খুব ভালো করেই জানেন। তবু ও-গুলো যে পাশ করা হয়েছে তা সুধু নিজেদের মনকে চোখ ঠারবার জন্যে। একটা-কিছু করতে হবে ত! সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স আরম্ভ করবার কথা শুনে প্রথমে মনে হয়েছিল যে কর্ত্তারা বুঝি সত্যি সত্যিই একটা-কিছু করতে চান। তারপর তাঁদের লেখা পড়ে' আর বক্তৃতা শুনে' সে ভ্রম আমাদের কেটে গেছে। খাঁটি অসহযোগের প্রধান পাণ্ডা শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারী বেশ ব্যাখ্যা করে' বুঝিয়ে দিয়েছেন যে পঞ্চাশ হাজার স্বেচ্ছাসেবক জোগাড় করা হবে সুধু গ্রামে গ্রামে গিয়ে চরকা প্রচলন আর সালিশী আদালত স্থাপন করবার জন্যে। সরকার বাহাদুর ত আর ছেলেদের নিশ্চিন্ত হয়ে এ সমস্ত কাজ করতে দেবেন না! বাস্, তা'হলেই ত সিভিল ডিসোবিডিয়েন্সের পালা সাঙ্গ হয়ে গেল—আবার কি চাই? আর ঐ যে পঁচিশ লক্ষ টাকা তোলা হবে তা খরচ হবে রেলভাড়ার জন্যে, টেলিগ্রাম করবার জন্যে, আর কাগজপত্র কিনতে। আইন-ভঙ্গ যদিও করা হয়, সেটা হবে ব্যক্তিগত ভাবে।

এঁদের কথা বেশ বুঝতে পারা যাচ্চে। এঁদের ধারণা এই যে আপাততঃ গ্রামে গ্রামে গিয়ে খদ্দর প্রচার করা যাক, আর অন্যান্য ভাবে দেশের লোকের সেবা-শুশ্রূষা করা যাক; গোটাকতক ন্যাশনাল স্কুল, পাঠশালা আর সালিশী আদালত বসাবার চেষ্টা করা যাক। এর জন্যে পুলিশে ধরে' জেলে দেয়, ত কি

আর করবো, জেলে যেতেই হবে। কিন্তু আপাততঃ এ সবের বাইরে 'পাদমেকং ন গচ্ছামি।' খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে' ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতে এঁরা যাবেন না।

নূতন দলও খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে' দেশজোড়া সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স আরম্ভ করবার জন্যে বিশেষ চেষ্টা করবেন বলে' মনে হয় না। নূতন দলের নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বলে' দিয়েছেন যে general mass civil disobedience—দেশব্যাপী আইন-ভঙ্গ করা—ব্যাপারটার ওপর তাঁর তেমন শ্রদ্ধা নেই। ওটা যে সম্ভবপর তা তিনি মনে করেন না। এইখানে দেখছি দু'দলেরই কার্য্যতঃ মিল রয়েছে। তবে তফাৎ এইখানে যে, পুরাতন দল চান যথাসম্ভব গোলমাল বাঁচিয়ে দেশের সেবা করতে, আর নূতন দল চান কাউন্সিলে ঢুকে স্থানে স্থানে ছোটখাট আইন-ভঙ্গ করে' আমলাতন্ত্রকে অস্থির করে' তুলতে। পুরাণো দল 'সিভিল', আর নূতন দল 'মিলিটারী'। পুরাতন দল যে-রাস্তা ধরে' চলেছেন, তাতে দেশের বর্ত্তমান শাসনপ্রণালী বদলে যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই, দেশ স্বাধীন হওয়া ত দূরের কথা; নূতন দল যে রাস্তা ধরে' চলতে চাইছেন তাতে দেশে খানিকটা অশান্তির সৃষ্টি হয়ে আমলাতন্ত্রের সঙ্গে একটা রফা পর্য্যন্ত হতে পারে; কিন্তু দেশ স্বাধীন করার আয়োজন এ নয়।

আসল কথা হচ্চে এই, যে-কার্য্যপ্রণালী তাঁরা ধরেছেন তাতে সমাজের নিম্নস্তর পর্য্যন্ত তাঁরা পৌঁছুতে পারবেন না; সুতরাং বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তনও হবে না।

কংগ্রেসে কৃষক সভা আর শ্রমজীবী সভা গড়বার জন্যে একটা প্রস্তাব পাশ হয়েছিল। কিন্তু পুরাণো দলের সবাই ও-কাজটাকে বাদ দিয়ে চলেছেন; বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিও ও-কাজে হাত দেবার কোনো চেষ্টা করেননি। নূতন দলের লোকেরাও কাউন্সিলের কথা নিয়েই ব্যস্ত। দু দলের লোকেরাই চান যে দেশে একটা রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন হয়ে যাক্! আর তার জন্যে দেশের জনসাধারণের সাহায্যও তাঁরা চান। কিন্তু সেই রাজনৈতিক 'পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে একটা সামাজিক আর রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনও যে আসা চাই, সে-কথাটা তাঁরা ভালো করে' ভাবেন না। আমাদের মনে হয় যে এদেশে একটা সামাজিক আর অর্থনৈতিক ওলট-পালট না হলে রাজনৈতিক ওলট-পালট হবে না। কংগ্রেসে দু দলই যতটা রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন চান ততটা সামাজিক বা অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন চান না।

দেশের জনসাধারণ যে-পরিবর্ত্তন চায়, কংগ্রেস তা চান না—সেইখানেই হয়েছে গোলমাল। অথচ জনসাধারণের সঙ্গে তাঁদের স্বার্থের যে বিরোধ আছে সেইটুকু তাঁরা চাপা দিয়ে চলতে চান! এরই ফলে আজ দেশব্যাপী নির্জ্জীবতা এসেছে; এরই ফলে কংগ্রেসের সব কথাই স্বধু ফাঁকা আওয়াজ হয়ে যাচ্চে।

জনসাধারণ যেদিন খাড়া হয়ে দাঁড়াবে, সেদিন তারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থার জন্যে দাঁড়াবে না, নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যেই দাঁড়াবে, যাঁরা দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের

জন্যে চেষ্টা করতে চান, তাঁদের কংগ্রেস কচ্‌কচি ছেড়ে দিয়ে ঐ জনসাধারণের মাঝখানে গিয়েই ডুব দিতে হবে। ঐখানেই শক্তির কেন্দ্র।

১০ই মাঘ, ১৩২৯

সামঞ্জস্য

কংগ্রেসে পুরাণো দল যত নির্জ্জীব হয়ে পড়ছেন, সেখানে তত নূতন দল দেখা দিচ্চে। সেই-সমস্ত নূতন দলের আদর্শ দেখলেই বুঝতে পারা যায় দেশের লোকের মন কোন্ দিকে যাচ্চে। পুরাণো দলের দেশ স্বাধীন করবার কার্য্যপ্রণালীর সার কথা—দেশব্যাপী আইন-ভঙ্গ করা, কিন্তু সে আয়োজন যে রকম ধীরে ধীরে চলেছে, আর তাঁদের আইন-ভঙ্গ করার ধারণা যে রকম, তাতে যে কস্মিন্-কালেও আইন-ভঙ্গ আরম্ভ করাই হবে—তা আশা করাই শক্ত। তাঁরা গ্রামে গ্রামে স্বেচ্ছাসেবক পাঠিয়ে খদ্দর প্রচার করে' আর নিজেদের পঞ্চায়েত সৃষ্টি করে' গ্রাম্য-সমিতিগুলি গড়ে' তুলবেন; সঙ্গে সঙ্গে অল্প-বিস্তর সমাজ-সংস্কার ও শিক্ষার ব্যবস্থাও হবে। তারপর গ্রাম্য-সমিতিগুলি গড়ে' উঠলে, দেশ শান্ত, সংযত, সংঘবদ্ধ হলে তাঁরা একসাথে দেশময় আইন-ভঙ্গ আরম্ভ করবেন—অন্ততঃ এইটাই তাঁদের বর্ত্তমান সঙ্কল্প।

বারদোলির অনুশাসনের পর থেকেই এই রকম কথা চলছে। এই রকম কার্য্যপ্রণালীর উপর কংগ্রেসের কর্ম্মীদের যে শ্রদ্ধা আছে, একথা তাঁদের অধিকাংশ লোক গয়ার কংগ্রেসে বলেছেন। কিন্তু

মজার কথা এই, বারদোলির অনুশাসন প্রচার হবার পর প্রায় এক বৎসর কেটে গেছে, তবু দেশকে সংঘবদ্ধ করবার আয়োজন যে এক পা-ও এগিয়েছে, তার প্রমাণ নেই। অনেকে বলেন কর্ম্মীদের মধ্যে উৎসাহের অভাবই তার প্রধান কারণ। কিন্তু উৎসাহের অভাবেরও ত কারণ কাছে।—সেটা কি?

স্বরাজ বলতে যে কি বোঝায়, তা কংগ্রেস এখনও স্পষ্ট করে' বলেননি। বিদেশের সঙ্গে সম্বন্ধই বা কি রকম থাকবে, আর দেশের জনসাধারণের অবস্থাই বা তখন কি হবে, বা হওয়া উচিত, সে-সম্বন্ধেও কংগ্রেস কোনো স্পষ্ট নির্দ্দেশ করেননি। চরকা কেটে নিজের হাতে খদ্দর তৈরী করে' পরলে কৃষকদের আর্থিক অবস্থা একটু ভালো হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাদের যে সমস্ত বড় দুঃখ-কষ্ট, তার অনেকটাই ঘুচবে না। জমিদার, মহাজন, হয়ত সমান-ভাবেই তাদের রক্ত চুষতে থাকবে; আর স্বদেশী পুলিশ যে বিদেশী পুলিশের চেয়ে কতখানি ভালো হবে, তা'ও এখনও জানা নেই।

সুতরাং কংগ্রেস এখন যে-পথ ধরে' গ্রাম্য-সমিতিগুলি গড়তে চাইছেন, সে-পথ ধরে' চললে আইন-ভঙ্গ যে কেমন করে' আরম্ভ হবে তা বোঝা কঠিন। সাধারণ লোকে স্বরাজের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বোঝে না, তাদের মোটা মোটা দুঃখ-কষ্টগুলো বোঝে। সেগুলো দূর করবার জন্যে আইন-ভঙ্গ করতে রাজী হবে। সেই অভাবগুলো দূর করবার জন্যে যদি তাদের সংঘবদ্ধ করবার চেষ্টা হয়, তা'হলে সে-চেষ্টা সফল হতে পারে, আর তাই থেকে আইন-ভঙ্গও আরম্ভ হতে পারে। কিন্তু যে-আদর্শ নিয়ে কংগ্রেস গ্রামে

গ্রামে খদ্দর-সমিতি স্থাপন করচেন, তা থেকে আইন-ভঙ্গ হবে কি করে', তা বোঝা যায় না। কংগ্রেসের নেতাদের কথামত দেশের লোক কি চক্ষু বুজে ঝুলে' পড়বে ?

দেখে-শুনে মনে হয় দেশের আইন অমান্য আরম্ভ করা পুরাণো দলের কর্ম্ম নয়। তাঁরা আরও কিছুদিন গ্রাম্য-সমিতি গঠন করবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করে' শেষে নির্জ্জীব হয়ে পড়বেন।

তারপর নূতন দলের কথা। নূতন দলের কার্য্যপ্রণালী এখনও সমস্ত জানা যায়নি। তবে যতদূর বোঝা যায়, তাতে মনে হয় তাঁরা কাউন্সিলে আর কাউন্সিলের বাইরে আমলাতন্ত্রের সঙ্গে নানারকম ছোটখাট সংঘর্ষ বাধিয়ে তা থেকে ক্রমে ক্রমে একটা দেশব্যাপী সংঘর্ষ সৃষ্টি করতে চান। আইন-ভঙ্গ আরম্ভ করবার এই যে প্রকৃষ্ট পন্থা তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু এই আইন-ভঙ্গ ব্যাপারটা সত্যি সত্যিই যদি দেশব্যাপী করতে হয় তা'হলে সুধু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকদের নিয়ে তা করলে চলবে না; সমস্ত দেশবাসীর তাদের সঙ্গে থাকা চাই। তার আয়োজন কি করে' হবে ? শোনা যাচ্ছে এই উদ্দেশ্যে নূতন দলের নেতারা কৃষক সঙ্ঘ আর শ্রমজীবী সঙ্ঘ গড়বার চেষ্টা করবেন। নাগপুরের কংগ্রেসে শ্রমজীবী সঙ্ঘ গড়বার একটা প্রস্তাব পাশ হয়েছিল। কিন্তু তা এখনও কার্য্যে পরিণত হয়নি। এবারেও কংগ্রেসে কৃষক আর শ্রমজীবীদের সংঘবদ্ধ করবার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, কিন্তু পুরাণো দল সেই মত কাজ করবার কোনো চেষ্টা করছেন বলে' আমরা জানিনে। নূতন দল হয়ত সত্যি সত্যিই সে-কাজটা হাতে নিতে পারেন; কেননা শোনা

যাচ্ছে যে তাঁদের স্বরাজে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর, আর হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতির কি রকম অধিকার থাকবে, তা এখন থেকেই ঠিক করে' দেবার জন্যে তাঁরা চেষ্টা করছেন। স্বরাজের আদর্শটা ঠিক কি রকম হবে তা আমরা জানিনে; তবে শোনা যাচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে স্বার্থের সামঞ্জস্য যাতে থাকে সেদিকে তাঁরা দৃষ্টি রাখবেন। কিন্তু খবরের কাগজে তাঁদের কার্য্যপ্রণালী যতটুকু প্রকাশ হয়েছে তা থেকে এই সামঞ্জস্যটা কি রকম হবে তা বোঝা যায় না। একটা কথা তাঁরা বলেছেন যে স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত অধিকার যাতে বজায় থাকে, সেদিকে তাঁরা নজর দেবেন; অধিকন্তু ও-বিষয়ে লোককে উৎসাহিত করবেন। কথাটার মানে ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না। পাছে লোকে তাঁদের "বলশেভিক" বলে' বদ্‌নাম দেয় এই ভয়েই নাকি তাঁরা ব্যক্তিগত অধিকারের ওকালতি করেছেন। এ কথা যদি ঠিক হয়, তা'হলে জমিদারদের স্বার্থের সঙ্গে রায়তদের স্বার্থের সামঞ্জস্য, বা কলওয়ালাদের স্বার্থের সঙ্গে মজুরদের স্বার্থের সামঞ্জস্যটা যে নিতান্ত একপেশে ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে, তা বোঝাই যাচ্ছে।

আরও একটা কথা এই যে, যাঁরা এই সামঞ্জস্য বিধান করবার চেষ্টা করছেন, তাঁদের মধ্যে কৃষক বা মজুরদের প্রতিনিধি কেউ নেই। তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ যাতে না বাধে—সেইজন্য এই সামঞ্জস্যের চেষ্টা হয়ত করছেন; কিন্তু তাঁদের কথামত জমিদার বা কলওয়ালারা নিজেদের স্বার্থ কি ছাড়বে? আর কৃষক

বা মজুরেরাই যে তাদের কথা মেনে নেবে তার প্রমাণ কি? সুতরাং একটা মনগড়া সামঞ্জস্য সৃষ্টি করলেই যে বিরোধ দূর করা যাবে তা ত মনে হয় না।

প্রকৃত সামঞ্জস্য তখনই হবে যখন কৃষক আর শ্রমজীবীরা নিজেদের সঙ্ঘ সৃষ্টি করে' স্বরাজ পাবার জন্যে ধনীদের সঙ্গে একটা রফা করবে। এখন আমাদের কাজ সেই কৃষক আর শ্রমজীবী সঙ্ঘ গড়ে' তাদের শক্তিমান করে' তোলা।

শ্রমিকেরা স্বতন্ত্র দল গড়বে বা আপাততঃ নূতন দলের সঙ্গেই কাজ করবে, সেটা নূতন দলের কার্য্যপ্রণালী বের হবার পর স্থির হতে পারে।

২রা ফাল্গুন, ১৩২৯
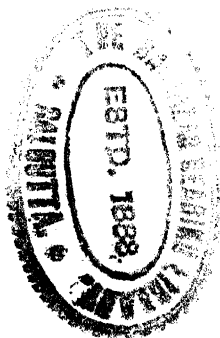
আমাদের পথ

একজন বিশিষ্ট বন্ধু "ধনী আর দরিদ্রের বোঝাপড়া" শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন যে, "ধনী আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করলে দেশের এখন ক্ষতির সম্ভাবনাই অধিক।" ধনী আর দরিদ্রের মধ্যে স্বার্থের যে বিরোধ আছে সে-কথাটা এখন উঠিয়ে কাজ নেই। কৃষিকার্য্যে যৌথপ্রণালী অবলম্বন করে' বা অন্যান্য উপায়ে প্রজাদের মঙ্গলসাধন করা যেতে পারে; আপাততঃ তাই করা যাক। তাতে যদি কৃষকদের অবস্থার উন্নতি না হয় তখন অন্য ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

তাঁর দ্বিতীয় যুক্তি হচ্চে এই যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণী বা ধনীদের সঙ্গে সংগ্রাম করে' অন্নের সংস্থান করে' নেওয়া খুব সোজা কথা নয়। কেননা, "শ্রমজীবীদের শক্তি ইংলণ্ডে যত বেশী এত আর কোথাও দেখি না।" তবু তারা নিজেদের সুবিধে করে' নিতে পাচ্ছে না কেন? ইতালীতেও ফ্যাসিষ্টরা কম্যুনিষ্টদের হারিয়ে দিলে কেন? সুধু জনবলে যে কাজ হয় না, তার প্রমাণ ত আমাদের নিজেদেরই দেশ! এত লোক, অথচ স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগ দেবার বেলা ক'জন আসে?

তাঁর তৃতীয় যুক্তি হচ্ছে এই যে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলটা এখনও পাকা হয়নি। এখন যদি জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রজারা ক্ষেপে উঠে, তা'হলে এদেশে যখন প্রজাদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা বেশী, আর জমিদারদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা বেশী, তখন জমিদার আর প্রজার ঝগড়াটা হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়া হয়ে দাঁড়াবে। সে একটা বিষম বিপদ।

চতুর্থ যুক্তি এই যে, দেশের স্বাধীনতা আনতে গেলেই যে ধনী আর মধ্যবিত্তদের ধ্বংস করতে হবে, এরই বা মানে কি? দেশের স্বাধীনতার জন্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে যত লোক পাওয়া গেছে, তত আর-কোন শ্রেণী থেকে পাওয়া যায়নি, সুতরাং কৃষক আর শ্রমজীবীরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিরুদ্ধে যদি যায়, ত তার ফলে অরাজকতার সৃষ্টি হবে মাত্র। ফরাসী-বিপ্লবের সময় যে অরাজকতা এসেছিল, তার ফল তো হোলো প্রায় শূন্য!

প্রায় এই রকম কথা আমরা আরও অনেক বন্ধুবান্ধবদের কাছে শুনতে পাই। তাঁদের প্রায় সকলেরই ধারণা যে সমস্ত দেশটাকে এক সূত্রে বেঁধে বিদেশীর ঘাড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া যাক। তারপর নিজেদের হাতে যখন রাজ্যটা আসবে তখন ঘরোয়া ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করা হবে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে বিদেশী-শাসনের বিরুদ্ধে দেশের সমস্ত লোককে একত্র করবার আশায় যাঁরা বসে' থাকবেন, তাঁদের চিরকালই বসে' থাকতে হবে। যাদের স্বার্থ বিদেশী আমলাতন্ত্রের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত, তারা নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখবার জন্যে যতটা

মাথা ঘামাবে দেশের স্বাধীনতার জন্যে ততটা মাথা ঘামাবে না। আমাদের দেশের অধিকাংশ ধনী লোকেরা এই কারণেই মডারেট। তাঁরা বিদেশী শাসনপ্রণালীটাকে একটু গা-সওয়া গোছের করে' নিতে চান; স্বাধীনতা চান না। তাঁদের খাতিরে দেশের জনসাধারণ নিজেদের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে যাবে কেন? সরকারী যে-সমস্ত খাজনা-ট্যাক্সের ফলে জনসাধারণের অসুবিধা হচ্ছে, জনসাধারণ সেগুলো ত উঠিয়ে দিতে চায়-ই; সঙ্গে সঙ্গে দেশের ধনী বা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যে-সমস্ত অন্যায় স্বার্থরক্ষার ফলে তাদের কষ্ট হচ্চে সেগুলোও উঠিয়ে দিতে চায়। প্রমাণ বাঙ্গলা দেশে রায়ত সভা, বেহারে হিন্দুস্থান, রাজপুতানায় কৃষাণ সভা, আর মালাবারে মোপলা বিদ্রোহ। সরকারের অত্যাচারই কি সুধু অত্যাচার, দেশের লোকের অত্যাচার কি অত্যাচার নয়? যারা জমিদারের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছে তাদের কাছে গিয়ে কি বলা হবে, যে হেতু জমিদার দেশী লোক, অতএব তাদের দেওয়া কষ্ট নির্ব্বিবাদে সহ্য কর, আর সরকারী খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ কর? স্বাধীনতার চেষ্টা অমন সুবিধামত ভাগাভাগি করে' আসে না। যারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তারা সব অন্যায়ের বিরুদ্ধেই দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় যুক্তি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে ধনী আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্যায় স্বার্থের বিরুদ্ধে লড়াই করে' প্রজাসাধারণের জয়ের সম্ভাবনা থাক আর নাই থাক, স্বাধীনতা সংগ্রামের ওটাও একটা অঙ্গ। ধনী বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দেশের স্বাধীনতার জন্যে যদি

সত্যিই প্রাণ কেঁদে থাকে, তা'হলে দরিদ্র জনসাধারণের জন্যে তাঁরা নিজেদের অন্যায় স্বার্থগুলি ছাড়তে রাজী হবেন না কেন? এর দ্বারা সুধু এইটুকু কি বোঝা যায় না যে, তাঁদের কাছে দেশের স্বাধীনতা মানে সুধু নিজেদের স্বার্থ? তা ছাড়া, ইংলণ্ডে শ্রমজীবীদের শক্তি অন্যান্য দেশের শ্রমজীবীদের শক্তির চেয়ে কম বই বেশী নয়; যাঁরা ইউরোপের শ্রমিক সঙ্ঘের খবর রাখেন তাঁরাই একথা জানেন। ইতালীতে ফ্যাসিষ্টি আন্দোলন প্রবল হয়েছে, কিন্তু ইতালীর ইতিহাস এখনও শেষ হয়নি। "জনবলে কাজ হয় না, তার প্রমাণ আমাদের দেশ"—এ কথাটাও ভুল। বিদেশী-স্বদেশী সবাই মিলে তাদের দাবিয়ে রেখেছে। সত্যি সত্যি কেউ তাদের স্বাধীনতার নামে ডাক দেয়নি। যেদিন তা দেবে, সেদিন এক মুহূর্ত্তে সব বন্ধন তারা ছিঁড়ে ফেলবে। তার নিদর্শন অতীতেও দু-একবার পাওয়া গেছে।

তারপর হিন্দু-মুসলমানের কথা। গোঁজামিল দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মিল হবে না। হিন্দু-মুসলমানের মিল হতে পারে তখন যখন তারা বুঝবে যে হিন্দুও মানুষ আর মুসলমানও মানুষ। হিন্দু জমিদারের অধীনে মুসলমান প্রজাকে দাবিয়ে রাখা হিন্দু-মুসলমান মিলন ঘটাবার প্রকৃষ্ট পথ নয়। যে অন্যায় অত্যাচার করবে, সে মারা যাবে, তা সে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক। মুসলমান প্রজাকে খলিফতের নামে ডাক দেওয়ার চেয়ে তার নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নামে ডাক দিলে ঢের বেশী ফল পাওয়া যাবে।

তারপর দেশের স্বাধীনতা আনতে গেলে ধনী আর মধ্যবিত্তদের

যে ধ্বংস করতে হবে, এ কথা আমরা বলি না। তবে এই কথা বলি ধনী আর মধ্যবিত্তদের যে সমস্ত অন্যায় স্বার্থ আছে, যার ফলে দরিদ্রেরা মারা পড়ছে, সেগুলি ছাড়তে হবে। তা যদি তাঁরা না ছাড়তে চান, তা'হলে বুঝতে হবে যে তাঁরা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা চান না, স্বাধীনতার নাম করে' নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখতে চান। "স্বাধীনতার জন্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে অনেক ত্যাগী লোক পাওয়া গেছে"—এ কথা ষোল আনা সত্যি নয়। একটু খোঁজ করলেই দেখা যাবে যে, যে-আদর্শের জন্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বীর পুরুষেরা লড়েছেন সেটাকে দেশের স্বাধীনতা নাম দেওয়া হলেও প্রকৃতপক্ষে সেটা তাঁদের নিজেদের শ্রেণীর স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সব দেশের ইতিহাসে এ কথা বার বার প্রমাণ হয়েছে। আইরিশ স্বদেশ-প্রেমিক O' Conolly-র Labour in Ireland বইখানি আমরা বন্ধুকে পড়তে অনুরোধ করি। আর তিনি যে লিখেছেন যে ফরাসী-বিপ্লবের ফল হয়েছে শূন্য—এটা একটা প্রকাণ্ড ভুল। সস্তায় কিস্তি মারবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। আমাদের দেশে যদি সত্যি সত্যিই স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করতে হয় তা'হলে এমন লোককে ডাক দিতে হবে যাদের নিজেদের স্বার্থ স্বাধীনতা না পেলে বজায় থাকে না। তারা কারা? ধনীও নয়, মধ্যবিত্তও নয়—এ গরীব কাঙ্গালের দল।

৯ই ফাল্গুন, ১৩২৯

ষোল আনা স্বাধীনতা

এই জিনিষটা আজ আমাদের ভালো করে' বুঝতে হবে যে আমাদের পরাধীনতা সুধু রাজনৈতিক পরাধীনতা নয়। রাজনৈতিক পরাধীনতা দূর করবার এ পর্য্যন্ত যে-সমস্ত চেষ্টা হয়েছে, সেগুলি যে ব্যর্থ হয়ে গেছে তার কারণ এই যে এদেশের রাজনৈতিক পরাধীনতার মূলে যে-সমস্ত কারণ রয়েছে, সেগুলি আমরা দূর করতে চাই না। মুখে যাই বলি, দেশের লোকের ষোল আনা স্বাধীনতা আমরা চাই না। কথাটা অপ্রিয় হলেও সত্য।

এই বাঙ্গলা দেশের কথাই ধরা যাক্। এখানে শতকরা অন্ততঃ পঁচাত্তর জন লোক চাষ করে' খায়, আর বাকি লোকেদের মধ্যে দু-পাঁচজন জমিদার বা বড় উকিল, ব্যারিষ্টার আর ব্যবসাদার। মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে অধিকাংশ হয় ছোটখাট ব্যবসাদার, না-হয় চাকরে বা ইস্কুল মাষ্টার। শতকরা পঁচাত্তর জন যারা চাষ করে বা মজুরি করে' খায়, তাদের মধ্যে অধিকাংশই দেশী জমিদারের প্রজা, সমাজিক হিসাবে তারা আমাদের কাছে "ছোটলোক"।

এখন কথা হচ্ছে এই যে, স্বাধীনতা বলতে আমরা কি বুঝি?

দেশে এই যে স্বাধীনতার আন্দোলন, ধনী, মধ্যবিত্ত আর দরিদ্র এই তিন শ্রেণীর কাছে এর অর্থ ভিন্ন ভিন্ন।

দেশের মধ্যে যারা ধনী লোক, যেমন জমিদার আর বড় বড় উকিল ব্যারিষ্টার বা সওদাগর—দেশে রাজনৈতিক স্বাধীনতা না থাকায় তাঁদের ক্ষতি হয়েছে কি? ইংরেজ রাজত্বের কল্যাণেই তাঁরা ফেঁপে-ফুলে উঠেছেন, ইংরেজ রাজত্বের সঙ্গেই তাঁদের প্রতিপত্তি জড়িত। ইংরেজ তাঁদের সঙ্গে সমানভাবে ব্যবহার করে না, বা ইংরেজ এদেশে থাকার দরুণ তাঁদের প্রভুত্ব যতখানি হতে পারতো ততখানি হয় না, এইটাই তাঁদের দুঃখ। তাঁরা যখন দেশের স্বাধীনতার কথা বলেন, তখন জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁরা নিজেদের দুঃখই দূর করতে চান। তাঁদের যে দেশপ্রীতি তার মূল হচ্চে নিজেদের আরও একটু প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা। এদেশে যদি উপনিবেশগুলোর মত স্বায়ত্ত্ব-শাসনের কাছাকাছি একটা-কিছু পাওয়া যায়, আর দেশের শাসনভার যদি এই শ্রেণীর হাতে পড়ে, তা'হলে আর স্বাধীনতার জন্যে এঁরা কেউ টুঁ শব্দটি করবেন না। এঁদের স্বাধীনতার ক্ষুধা মিটে যাবে।

তারপর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কথা ধরা যাক। ইংরেজ রাজত্বে দেশের বড় বড় চাকরী পরহস্তগত হয়েছে, ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা নেই; সুতরাং এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী দিন দিন দরিদ্র হয়ে পড়েছে। ইংরেজী শিখে, চাকরী করে' যতদিন এদের পেট ভরতো, ততদিন এরা রাজনৈতিক আন্দোলনে খুব বেশী যোগ দেয়নি। এরাই দেশের শিক্ষিত লোক; আত্মসম্মানবোধ এদের অনেকটা আছে।

সুতরাং বিদেশের লোকের সঙ্গে নিজেদের অবস্থার তুলনা করে' যখন এদের মন চঞ্চল হয়ে উঠতো, তখন স্বাধীনতার সুখস্বপ্ন এরা দেখতো বটে, কিন্তু সেই প্রাণের জ্বালার সঙ্গে যখন পেটের জ্বালা এসে যোগ দিলে, তখন তারা বিদ্রোহী হয়ে দাঁড়াল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের পর দেশে যে বিপ্লবপন্থীর দল দেখা দিয়েছিল, তারা সবাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। বিপ্লবপন্থীদের নামের তালিকা দেখলে দেখা যায় যে তারা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ না-হয় বৈদ্য। অন্য শ্রেণীর লোকও ছিল ; কিন্তু তাদের সংখ্যা খুবই কম। বিপ্লবপন্থীরা দেশের স্বাধীনতা চাইতো বটে, কিন্তু সে-স্বাধীনতার মানে ইংরেজের বদলে দেশের উপর নিজেদের শ্রেণীর প্রভুত্ব।

বিপ্লবযুগের পর কংগ্রেসের প্রতিপত্তি খুব বেড়ে গেছে! আগে যারা বিপ্লবপন্থী ছিল, মহাত্মা গান্ধীর সংস্পর্শে এসে তারা অনেকেই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস এখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই প্রতিষ্ঠান ; তাদের আশা ও আকাজ্ক্ষার মূর্ত্তরূপ। কিন্তু কংগ্রেস কি চায়? মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন যে তিনি উপনিবেশগুলোর মত স্বায়ত্ত-শাসন পেলেই সন্তুষ্ট। অসহযোগীদের একখানা প্রধান কাগজ, মাদ্রাজের "স্বরাজ্য" সেদিন বেশ স্পষ্ট করেই লিখেছে যে অসহযোগীরা ইংরেজী শাসন-প্রণালীর কাঠামটা বদলাতে চায় না। ওটা এখন ইংরেজদের স্বার্থরক্ষার জন্যে ব্যবহার করা হচ্চে ; তা না হয়ে যদি দেশীলোকের স্বার্থরক্ষার জন্যে ব্যবহার করা হয় তা'হলেই অসহযোগীরা তুষ্ট হবে। কিন্তু এই দেশীলোক কারা? বর্ত্তমান শাসনযন্ত্র দেশীলোকের

হস্তগত হলে কোন্ শ্রেণীর স্বার্থ পুরোপুরি রক্ষা করা হবে? দেশে উপনিবেশের মত স্বায়ত্ত্ব-শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সরকারী চাকরীগুলো মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হস্তগত হবে; আইন-কানুন করবার ক্ষমতা দেশের ধনী আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে আসবে; দেশে কল-কারখানা আর ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অর্থবলও বাড়বে। কিন্তু প্রশ্ন এই দেশের কতজন লোক এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত? দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বাধীনতা লাভ মানে কি সারা দেশের স্বাধীনতা লাভ?

তোমরা হয়ত বলবে—"কেন? যাদের হাতে প্রভুত্ব এসে পড়বে, তারা সকলকে সেই স্বাধীনতার, সেই প্রভুত্বের, সেই অর্থের ভাগ দেবে!" আমরা বলি—"তা যে দেবে, তার প্রমাণ কই? আজকাল যখন স্বাধীনতার কথা ওঠে, তখন স্বাধীনতার খাতিরে জমিদার কি নিজেদের জমিদারী ছাড়তে চায়? দেশে যে-সমস্ত বড় বড় কলওয়ালা আছে, তারা কি স্বাধীনতার খাতিরে নিজেদের কুলি-মজুরদের মাইনে বাড়িয়ে দিতে চায়? দেশের যত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জোতদার বা পত্তনিদার কি নিরন্ন প্রজার খাতিরে নিজেদের স্বার্থ ছাড়তে চায়? এখন চায় না; তা আবার নিজেদের হাতে প্রভুত্ব এলে, ত আরও চাইবে না।

ধনী বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রকৃতপক্ষে যা চায়, তা হচ্চে এই যে, তাদের নিজেদের রাজনৈতিক পরাধীনতা ঘুচে' যাক; কিন্তু দেশের জনসাধারণের উপর তাদের যে আর্থিক বা সামাজিক প্রতিপত্তি আছে, তা ষোল আনা বজায় থাক। আজও কংগ্রেসের কর্ত্তারা

যখন দেশের জনসাধারণের সঙ্গে মিশতে যাচ্চেন, তখন বলছেন,—'তোমরা সরকারী খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ কর; কিন্তু দেখো, যেন জমিদারের গায়ে আঁচড়টি পর্য্যন্ত না লাগে। বিদেশী কলওয়ালা যেন এদেশের টাকা লুঠতে না পারে; কিন্তু খুব হুঁসিয়ার, সঙ্গে সঙ্গে দেশী কলওয়ালার যেন ক্ষতি না হয়।

তা ত হবেই! দেশী কলওয়ালা যে কংগ্রেস ফণ্ডে চাঁদা দেয়; আবার তাদের টাকা নিয়েই নাকি কংগ্রেস শ্রমিকসংঘ গড়বে!

এ পর্য্যন্ত স্বাধীনতার আন্দোলন যে সফল হয়নি, তার কারণ হচ্চে এই যে সে-স্বাধীনতার আন্দোলন সুধু শ্রেণীবিশেষের আন্দোলন; আর সে-স্বাধীনতা সুধু স্বাধীনতার ভ্যাংচানি মাত্র; দেশের অধিকাংশ লোকের সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক মুক্তির বার্ত্তা তার মধ্যে নেই।

দেশের যারা জনসাধারণ, বিদেশী ও স্বদেশীর পায়ের তলায় যারা সমানভাবে দলিত—তারা ষোল আনা স্বাধীনতা চায়; এক সঙ্গে রাজনৈতিক, সামাজিক আর আর্থিক মুক্তিই তাদের কাম্য। স্বাধীনতার নাম করে' যে তাদের ডাক দেবে, তার সুধু আংশিক স্বাধীনতার কথা বললে চলবে না; ষোল আনা স্বাধীনতা দেবার জন্যে তাকে প্রস্তুত হতে হবে।

২৩এ ফাল্গুন, ১৩২৯

অসহযোগ মরছে কেন?

অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হবার পর তিন বৎসর হয়ে গেছে; আজ তার ফলাফল বিচার করবার সময় এসেছে।

এ আন্দোলনের গোড়ার কথা এই—মানসিক দাসত্ব থেকেই আমাদের বাইরের দাসত্ব এসেছে; অতএব মানসিক দাসত্ব দূর করবার জন্যে আগে বিদেশী আমলাতন্ত্রের সব সংস্রব ত্যাগ কর; তাদের স্কুল-কলেজে পোড়ো না, তাদের আদালতে মামলা-মোকদ্দমা কোরো না, তাদের দেওয়া উপাধি নিও না, তাদের আইন-কানুন তৈরী করার ভেতর থেকো না; যথাসম্ভব স্বাবলম্বী হও, আর তারপর যদি দরকার হয় ত খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে' দাও আর সব আইন অমান্য করতে সুরু করো। তা'হলেই বিদেশী আমলা-তন্ত্র ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য হবে।

কিন্তু আমলাতন্ত্র এই তিন বৎসর পরেও ভেঙ্গে পড়েনি; আর প্রত্যক্ষ যদি প্রমাণ হয় তা'হলে এ কথা অস্বীকার করে' কোনো লাভ নেই যে বরং অসহযোগ আন্দোলনটাই ভেঙ্গে পড়বার জোগাড় হয়েছে। দেশের লোকের মনে প্রথমে যে উৎসাহ দেখা গিয়েছিল, আজ তার একেবারেই অভাব; আর যে-সমস্ত কর্ম্মী

অসহযোগ-পন্থা অবলম্বন করে’ দেশ-উদ্ধারের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন আজ তাঁদেরও মন সন্দেহে ভরে’ গেছে। কংগ্রেস অফিসগুলি এক কোণে টিম্ টিম্ করছে; দেশের জনসাধারণের সঙ্গে সেগুলির নাড়ীর যোগ যেন ছিঁড়ে গেছে। লোকে আর কংগ্রেস-কর্ম্মীদের কথায় বড় একটা কান দেয় না। অসহযোগের যাঁরা নেতা, কর্ম্মপন্থা নিয়ে তাঁদের মধ্যে ভীষণ মতভেদ দেখা দিয়েছে; যাঁরা সাবেক পন্থা পুরোপুরি বজায় রেখে খাঁটি অসহযোগী থাকতে চান, তাঁরাও এখন আর জোর করে’ বলতে চান না যে এই পন্থাতেই দেশের মুক্তি আসবে। কোন্ পন্থা খাঁটি অসহযোগ, আর কোন্‌টা তা নয়—এই কথাই এখন নেতাদের কাছে বিচার্য্যের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাধীনতার কথাটা ক্রমেই চাপা পড়ে’ আসছে।

এ সব মতভেদ আর মনোমালিন্য যে অকৃতকার্য্যতার ফল তা বলাই বাহুল্য। যতদিন লোকের মনে কৃতকার্য্য হবার আশা ছিল ততদিন এ সমস্ত লক্ষণ দেখা দেয়নি।

এখন প্রশ্ন এই—কেন এমন হলো, আর এই নৈরাশ্য দূর করবার কোনো উপায় আছে কি না ?

দেশের তেত্রিশ কোটী লোক যদি বিদেশী আমলাতন্ত্রের সংস্রব ছেড়ে দেয়, আর খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে’ দেয়, তা’হলে এই আমলাতন্ত্র যে কাজের বার হয়ে পড়বে আর ক্রমশঃ শুকিয়ে মারা যাবে, এ কথাটা বুঝতে বেশী দেরী লাগে না। কিন্তু তাই যদি হয় তা’হলে দেশের লোক সে-কাজটা করে না কেন ? সে প্রশ্নের উত্তর এই যে কথায় কথায় আমরা যে-তেত্রিশ কোটীর দোহাই

দি, সে-তেত্রিশ কোটীর স্বার্থ এক রকম নয়। দেশে এমন অনেক শ্রেণীর লোক আছে যারা এই বিদেশী আমলাতন্ত্রের আশ্রয়ে বেড়ে উঠেছে, যাদের আর্থিক স্বার্থ এই বিদেশী আমলাতন্ত্রের সঙ্গে জড়িত। তারা যে দেশের বাকি লোকের স্বাধীনতার জন্যে নিজেদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেবে, সে আশা করাই ভুল। তারপর দেশে এমন লোকেরও অভাব নেই যারা ইচ্ছাসত্ত্বেও আমলা-তন্ত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ কাটাতে পারে না। সুতরাং শাসনযন্ত্র চালাবার জন্যে যত লোকের দরকার ততজন লোকের অভাব এদেশে কখনো হবে না। দেশের সমস্ত লোকের সর কারী সম্পর্ক ত্যাগ করার উপর যে-কর্ম্মপন্থার সাফল্য নির্ভর করে সে-কর্ম্মপন্থা ব্যর্থ হবেই।

যাদের স্বার্থ আমলাতন্ত্রের স্বার্থের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত নয়, তারাই অসহযোগনীতি গ্রহণ করতে পারে; কিন্তু তাদের যদি অসহযোগনীতি সফল করতে হয় তা'হলে সুধু স্কুল-কলেজ, আদালত বা ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জনের দিকে দৃষ্টি রাখলেই চলবে না। এগুলোর উপর নির্ভর করে' আমলাতন্ত্র বেঁচে নেই, এগুলো যদি ষোল আনা বর্জ্জন করা যায় তা'হলেও আমলাতন্ত্র ভেঙ্গে পড়বে না। এই অসহযোগনীতির মধ্যে একমাত্র জিনিষ যা আমলা-তন্ত্রকে ভাঙ্গতে পারে তা খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ। কিন্তু আমাদের দেশে সাধারণতঃ যে-শ্রেণীর লোক রাষ্ট্রনীতির চর্চ্চা করে' থাকেন তাঁরা সবাই যদি খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করেন, তা'হলেও আমলাতন্ত্রের বিশাল পকেট শূন্য হবে না। দেশের জনসাধারণের অধিকাংশ

যদি কোনো দিন খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে তা'হলেই অসহযোগনীতি সফল হতে পারে।

কিন্তু জনসাধারণকে স্বাধীনতা-সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা সফল হয়নি, জনসাধারণের দোষে নয়, অসহযোগী নেতাদের দোষে। তাঁরা চেয়েছিলেন দেশের জনসাধারণকে তাঁদের নিজেদের ইচ্ছামত কাজে লাগাতে, কিন্তু দেশের জনসাধারণ সত্যি সত্যি কি চায়, তা নির্দ্ধারণ করবার চেষ্টা করেননি। কংগ্রেস অফিসের কোণে বসে' তাঁরা ঠিক করলেন যে দেশ চায় আধ্যাত্মিক স্বরাজ আর উপায় হচ্চে অহিংস অসহযোগ। কিন্তু পোড়া দেশের লোক আধ্যাত্মিক স্বরাজ চায় কি আধিভৌতিক স্বরাজ চায়, তা কেউ মাঠে গিয়ে চাষাদের কাছে কিম্বা কল-কারখানায় গিয়ে মজুরদের কাছে জিজ্ঞেস করেননি। অথচ এই মেঠো চাষা আর মজুরই দেশের তেত্রিশ কোটির ভেতর বত্রিশ কোটি। কোন্ দুঃখ প্রতিদিন তাদের মুখের গ্রাস তিক্ত করে' তুলছে, কোন্ অত্যাচারে তাদের মনুষ্যত্ব প্রতিদিন পরের পায়ে দলিত হচ্চে, কেমন করে' সেই দুঃখ, দারিদ্র্য, অত্যাচারের প্রতিকার হবে—সে-সব কথার কোনো স্পষ্ট উত্তর কেউ দিলেন না; মাঝে থেকে কতকটা আধ্যাত্মিক কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করে' নিজেদের বুদ্ধি ও দেশের লোকের বুদ্ধি ধোঁয়াটে করে' তুললেন। দেশের চাষারা যখন নিজেদের বুদ্ধি আর শক্তি মত সংঘবদ্ধ হয়ে নিজেদের দুঃখ দূর করবার জন্যে খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করলে তখন অসহযোগ নেতারা 'ভালো করতে পারিনে মন্দ করতে পারি' এই নীতির অনুসরণ করে' হুকুম দিলেন—

"Complaints having been brought to the notice of the Working Committee that ryots are not paying taxes to the Zeminders, the Working Committee advises Congress workers and organisations to inform the ryots that such withholding of rents is contrary to the resolutions of the Congress and that it is injurious to the best interests of the country."

এ হুকুম যে স্বধু জমিদারের খাজনার ব্যাপারে হয়েছিল তা নয়, সরকারী ট্যাক্স সম্বন্ধেও হয়েছিল।

এর ফলে দেশের চাষা-ভূষো লোকে বুঝলে যে বাবুরা যে-স্বরাজ চান তার সঙ্গে জনসাধারণের প্রতিদিনের দুঃখ ঘোচাবার কোনো সম্বন্ধ নেই। নেতারা যখন তাদের বল্লেন—"তোমরা ঘরে গিয়ে চরকা কাট আর জমিদারের দরোয়ানের আর সরকারী পুলিসের গুঁতো নির্ব্বিবাদে হজম করে' তিতিক্ষাসাধন করো"—তখন তারা অবিশ্বাসের ম্লান হাসি হেসে চুপ করে' বসে' রইলো। এ কথা তারা কিছুতেই বুঝতে পারলে না যে পেটের জ্বালায় আর অত্যাচারের তাড়নায় তারা যা করছে তা কেমন করে' হয়ে দাঁড়াল injurious to the best interests of the country! তা'হলে country মানে কি স্বধু কংগ্রেসী নেতার দল?

আজ যদি জনসাধারণের ভাঙ্গা মন আবার জোড়া দিতে হয় তা'হলে সমস্ত ধোঁয়াটে কথা ছেড়ে দিয়ে, সব রকম আধ্যাত্মিক

ন্যাকামী দূর করে' খুব স্পষ্ট ভাষায় দেশের লোককে বুঝিয়ে দিতে হবে—স্বরাজ মানে কি। আর স্বরাজ হলে তারা এখন যেমন কলুর বলদ হয়ে আছে তাই থাকবে, না মানুষের মত ব্যবহার পাবে। যে-জমি তারা চাষ করে, সে-জমির মালিক কি তারা হবে ? যে-কারখানায় খেটে তারা প্রাণপাত করে, সে-কারখানার লভ্যাংশ কি তারা পাবে ? রোগে তাদের চিকিৎসা হবে ? তাদের ছেলেপিলের শিক্ষার ব্যবস্থা হবে ? আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক—সব বিষয়ে তারা সমানাধিকার পাবে ত ?

অসহযোগের নেতারা যদি দেশকে জাগাতে চান তা'হলে এই সব কথার সদুত্তর দিতে হবে, আর হিংসা শ্রেয়ঃ কি অহিংসা শ্রেয়ঃ এ কথার মীমাংসার ভার নিজেদের হাতে না নিয়ে দেশের বিধিনির্দ্দিষ্ট প্রকৃতির উপর ছেড়ে দিতে হবে। এ কথা তাঁদের বুঝতে হবে যে দেশ তাঁদের নয়, তাঁরাই দেশের; দেশ তাঁদের খেয়ালমত চলবার জন্যে জন্মায়নি, তাঁরাই দেশের সেবা করতে জন্মেছেন। সেবার নামে যদি তাঁরা দেশের উপর আধিপত্য করতে চান, তা'হলে দেশ নিজের রাস্তা নিজে বেছে নেবে—তাঁরাই ঘরের কোণে পড়ে' পড়ে' আর্ত্তনাদ করতে থাকবেন।

১৯এ আষাঢ়, ১৩৩০
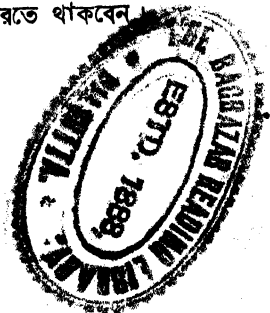
প্রোলিটারিয়েট বনাম বুর্জোয়া

দেশের কংগ্রেসী-কাগজওয়ালাদের একটি বাঁধা সুর হচ্চে এই —"দেশকে জাগাবার জন্যে আর যা-কিছু পারো তা করো, কেবল জমিদারদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ক্ষেপিয়ে তুলো না।" এই শ্রেণীর একখানি খবরের কাগজে সেদিন লেখা হয়েছে :—

"দেশের কৃষকদের প্রতি যে অবিচার হইতেছে, মিল-ফ্যাক্টরীতে শ্রমিকদের মনুষ্যত্ব যেমন নির্ম্মমভাবে নষ্ট করা হইতেছে, তাহাতে এদেশের লোকের বাঁচিয়া থাকা সম্ভবপর হইবে না। এ কথা খুবই সত্য, কিন্তু ইহাও মিথ্যা নয় যে সমাজের এক শ্রেণীর সঙ্গে অপর শ্রেণীর দ্বন্দ্ব সুরু হইলে দেশের মঙ্গল সাধিত হইবে না।······

"এ কথার উত্তরে অবশ্য এমন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে তাহা হইলে কি আমাদের শ্রমিক, আমাদের কৃষকেরা যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিন অত্যাচার সহিয়াই যাইবে, মানুষের জন্মগত অধিকার কি কখনো তাহারা ভোগ করিতে পারিবে না ?······

"প্রোলিটারিয়েটকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য এমন দাওয়াই আবিষ্কার করিতে হইবে যা ব্যাধি দূর করিবার সঙ্গে সঙ্গে শরীরকে বিষাক্ত করিয়া না রাখে।······

"প্রোলিটারিয়েটের কাছে পরাজিত হইলেও বুর্জোয়া যে সে-পরাজয়ের গ্লানি বুকে জমা করিয়া রাখিবে না এবং সেই দিনের প্রত্যাশা করিবে না যেদিন সে এই পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতে পারে, এরূপ মনে করিবার হেতু নাই।......

"বুর্জোয়ার প্রভুত্ব কমাইতে হইবে, তার স্বার্থভরা মনে যাহাতে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও সমবেদনা জাগিয়া উঠে তাহাই করিতে হইবে।......

"প্রোলিটারিয়েটকে এমন করিয়া গড়িতে হইবে যাহাতে বুর্জোয়া আপনি তাহার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করিবার জন্য স্বেচ্ছায় নিজের স্বার্থ প্রোলিটারিয়েটকে অনেকটা ছাড়িয়া দেয়, অর্থাৎ প্রোলিটারিয়েটদের মাথায় যাহাতে খুন না চাপে তাহার দিকেই নজর দিতে হইবে।"

প্রবন্ধটির যে যে অংশ উপরে উদ্ধৃত করা গেল, মোট কথায় তার সার অর্থ হচ্চে এই—"জমিদার আর কলওয়ালার হাতে পড়ে' চাষার আর মজুরের অনন্ত দুর্গতি হয়েছে, তা ঠিক ; আর এ রকম অবস্থায় বেশীদিন থাকলে তারা যে মরে' ভূত হয়ে যাবে এও ঠিক। কিন্তু দোহাই তোমাদের, জমিদার আর কলওয়ালা বাবুদের যতদিন না সুবুদ্ধি হয়, তাঁরা নিজের স্বার্থ ভুলে' গিয়ে যতদিন না চাষা আর মজুরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করবার জন্যে প্রেরণা পান, ততদিন চাষা আর মজুরদের একটু ধৈর্য্য ধরে' তিতিক্ষাসাধন করতে বলো। কেননা চাষারা জোর করে' যদি জমিদারদের হারিয়ে দেয়, বা মজুরেরা কলওয়ালাদের হারিয়ে দেয় তা'হলে জমিদার ও কলওয়ালা

বাবুদের বা তাঁদের বংশধরেরা মনে মনে ভারী চটে' থাকবেন; আর সেই চটাচটির ফলে দেশের একতা নষ্ট হবে; আর সে-একতা নষ্ট হলেই অহিংসভাবে স্বরাজ স্থাপনের experimentটা ব্যর্থ হয়ে যাবে।"

তেত্রিশ কোটী লোকের মধ্যে যে-দেশে ত্রিশ কোটী লোক চাষা আর মজুর, সেখানকার স্বদেশ-প্রেমিক বীরেরা দেশের লোককে উপদেশ দিচ্ছেন—'আগে জমিদার আর কলওয়ালারা শ্রদ্ধা আর সমবেদনা সম্পন্ন হয়ে স্বেচ্ছায় তাঁদের নিজেদের স্বার্থ ছাড়ুন, তারপর তোমরা নিজেদের দুঃখ ঘোচাবার চেষ্টা কোরো, ঐ সমস্ত গুণ তাঁদের মধ্যে আসবার আগে যদি তোমরা মরে' পচে' যাও, তা আর করবে কি! কিন্তু খুব হুঁসিয়ার! দেখো যেন পেটের জ্বালায় বা অপমান অত্যাচারে তোমাদের মাথায় খুন না চাপে; তা'হলে দেশের এত সাধের আধ্যাত্মিকতা একদম নষ্ট হয়ে যাবে।"

দেশের আড়াইজন জমিদার বা কলওয়ালার মনে পাছে বিদ্বেষের বীজ থেকে যায় এই ভয়ে যাঁরা লক্ষ লক্ষ লোকের দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্যে বজায় রাখতে চান, তাঁদের আধ্যাত্মিকতা আর প্রেমের বালাই নিয়ে মরতে ইচ্ছে হয়। তাঁদের প্রেম জিনিষটা এত এক তরফা হচ্চে কেন, তা তাঁরা কখনও ভেবে দেখেছেন কি? যে মনোবৃত্তির ফলে বিদেশী শাসক-সম্প্রদায় Law আর Order-এর দোহাই দেন, যার ফলে মাঝে মাঝে বিলেতের পার্লামেণ্টে ভারতের জন্যে পঙ্গু Sympathyর ফোয়ারা ছোটে, আধ্যাত্মিকতার মুখস পরে' সেই জিনিষই যে তোমাদের স্বাধীনতার চেষ্টা ব্যর্থ করে'

দিচ্ছে, এ সন্দেহ কি কখনও তোমাদের মনে আসেনি? দেশে গোলমাল হলে পাছে তোমাদের নিজেদের শ্রেণীর স্বার্থ নষ্ট হয়, এই ভয়ই তোমাদের আড়ষ্ট করে' রেখেছে। দেশের স্বাধীনতার চেয়ে নিজেদের স্বার্থের দিকেই তোমাদের ঝোঁক বেশী; তাই প্রাণ ভরে' তোমরা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা করো না—দেশের সমস্ত শক্তিকে ভাক্ত আধ্যাত্মিকতার চাপে পঙ্গু করে' দিতে চাও। কিন্তু এ কথা ভুলো না যে ধ্বংস সৃষ্টিরই পূর্ব্বাভাষ, রুদ্র শিবেরই আর-এক রূপ, আর বিপ্লব সেই রুদ্রের নয়ন-নিসৃত ক্রোধাগ্নি!

ভগবান সুধু 'নাড়ু-গোপাল' নন্, কখন কখন তিনি 'লোকক্ষয়কৃৎ কাল'।

১৬ই শ্রাবণ, ১৩৩০

আন্দোলন ভাঙ্গে কেন ?

'বাংলার অপ্রকাশিত ইতিহাসের এক অধ্যায়' লেখবার সময় ভূতপূর্ব্ব "যুগান্তর"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন,—"গণসঙ্ঘ কথনও বৈপ্লবিকদের হাতে আসে নাই। তাহাদের কি উপায়ে হাতে লইতে হইবে তাহা আমরা জানিতাম না, পরবর্ত্তীরাও জানিতেন না এবং বোধ হয় এখনও নেতারা জানেন না।"

কথাগুলো খুবই সত্যি ; আর সত্যি বলেই আমাদের দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন ক্রমাগতই মাঝপথে ভেঙ্গে পড়েছে। আমাদের মধ্যে যাঁরা ধনী বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক তাঁরা violent আর non-violent দু রকম পথ ধরেই দেখেছেন। তার ফলে কিছু যে লাভ হয়নি তা নয়, কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনের যেটা মূল লক্ষ্য—জাতীয় স্বাধীনতা লাভ—সেটা দূরেই পড়ে' আছে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ-বিভাগের পর যে আন্দোলনের সৃষ্টি হয় তার পিছনে ছিলেন প্রধানতঃ কয়েকজন ধনবান হিন্দু জমিদার আর বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী। মুসলমানদের মধ্যে ইতর-ভদ্র প্রায় সবাই সে-আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন, আর হিন্দু

জনসাধারণ বঙ্গ-বিভাগের ফলে কি ক্ষতি হল তা ভালো করে' বুঝতেই পারেনি। এই আন্দোলনের খানিকটা আঁচ যে জনসাধারণের গায়ে লেগেছিল তার কারণ হচ্চে এই যে বিদেশী-পণ্য-বর্জ্জন চেষ্টার ফলে অনেক দেশী শিল্পী লাভবান হতে আরম্ভ করেছিল। আন্দোলনের সঙ্গে তাদের সহানুভূতির সেইটাই ছিল মূল কারণ।

সরকার বাহাদুরের গুর্খার গুঁতোয় যখন বিদেশী-পণ্যবর্জ্জন কঠিন হয়ে পড়লো, তখন জনসাধারণের উৎসাহ কাজে কাজেই কমে' গেল। বোমা-রিভলভারের সাহায্যে যাঁরা বিদেশী আমলাতন্ত্র উড়িয়ে দেবার সঙ্কল্প করে' কার্য্যক্ষেত্রে নামলেন, তাঁরা প্রধানতঃ ভদ্রশ্রেণীর লোক। বিদেশীর শাসনে বাস করে' তাঁদের আত্মসম্মান-বোধ প্রতিপদেই ক্ষুণ্ণ হতো, আর সেই অপমানবোধই তাঁদের রাজনৈতিক বিপ্লব-চেষ্টার গোড়ার কথা। কিন্তু বিদেশী-শাসনের যে অপমান, জনসাধারণের সে অনুভূতি প্রবল নয়। আমরা নিজেরাই জনসাধারণকে সামাজিক আর আর্থিক হিসাবে এমনি দাবিয়ে রেখেছি যে তাদের আত্মসম্মানবোধ কখনও প্রবল হতে পায়নি, কাজে কাজেই এই বিপ্লব-চেষ্টায় জনসাধারণ যোগ দেয়নি।

তারপর অসহযোগ আন্দোলনের প্রথমাবস্থায় যখন মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে হিন্দু আর মুসলমান বিদেশী আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তখন অনেকে মনে করেছিলেন যে সত্যিই বুঝি এটা ভবিষ্যৎ ভারতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বাভাষ। অনেকেই ঠিক করেছিলেন যে পাঞ্জাবের অপমান আর খেলাফতের

লাঞ্ছনা হিন্দু-মুসলমান ইতর-ভদ্র সকলের হাড়ে হাড়ে বিঁধেছে, আর এই দুটোর প্রতিকার চেষ্টা করতে করতেই মহাত্মার নেতৃত্বে ভারতে স্বরাজ এসে পড়বে। অশিক্ষিত জনসাধারণ যখন বাত্যাবিক্ষুব্ধ-সাগরের মতো চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, তখন তাদের অর্দ্ধস্ফুট গর্জ্জন শুনে অনেকেই আশায় নেচে উঠেছিলেন, অনেকেই ভেবেছিলেন এটা নেতৃত্বের মাহাত্ম্য, অহিংস আন্দোলনের আলৌকিকত্ব।

নেতৃত্বের মাহাত্ম্য যে এই আন্দোলনের মধ্যে অনেকখানি ছিল, তাতে কারো সন্দেহ নেই; কিন্তু এর মূলে যে তা ছাড়া আরও অনেক কারণ বর্ত্তমান ছিল, তা প্রমাণিত হতে বেশী দিন লাগেনি। বিগত ইউরোপীয় যুদ্ধের ফলে এ দেশের অন্ধ জনসাধারণেরও চোখ ফুটতে আরম্ভ করেছিল, তাদের মূক মুখেও ভাষা ফুটেছিল। চারিদিকের দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অত্যাচার উৎপীড়নের ফলে তারা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। তাই যখন দীন-হীন শীর্ণ তপঃক্লিষ্ট মহাপুরুষের মুখ থেকে তেজোগর্ভ আশার বাণী বেরিয়েছিল, যখন তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে এক বৎসরের মধ্যেই তাদের দুঃখ যন্ত্রণার অবসান হয়ে দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন এই দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট, মহামারী-পীড়িত, অত্যাচারিত জন-সাধারণ উন্মত্ত হয়ে তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। কোটি কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল—"গান্ধী মহারাজ কী জয়।"

তারপর এমন একদিন এলো যখন এই স্বরাজ কথাটা জনসাধারণের কাছে একটা অর্থশূন্য প্রহেলিকা হয়ে দাঁড়াল।

যে-জমিদারের জ্বালায় প্রজারা অস্থির হয়ে উঠেছিল, স্বরাজ হলেও নাকি তাদের এই জমিদারের প্রজা হয়েই থাকতে হবে, জমিদারের খাজনা বন্ধ করলে নাকি স্বরাজলাভের পথে কাঁটা পড়বে—ইত্যাদি অনেক রকম কথাই তারা শুনলে। প্রথমেই তারা বলে' উঠল—'এ সব কথা গান্ধী মহারাজের নয়। এ সব দুষ্ট লোকের বানানো কথা।' তারপর যখন বড় বড় অহিংস অসহযোগীরা তাদের জানিয়ে দিলে যে—'হাঁ, গান্ধী মহারাজের বাণী' তখন তারা বিস্ময়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে করতে ম্লান মুখে ঘরে ফিরে গেল। তাদের অন্তরের কথা অন্তর্য্যামীই বলতে পারেন, কিন্তু সেই দিন থেকে আর তারা এই আন্দোলনের দিকে চায় নি। আমাদের স্বরাজের আদর্শে যে জনসাধারণের মন ভরে না, এতে এই কথাটাই প্রতিপন্ন হলো।

তারপর ঐ ভাঙ্গা মন জোড়া দেবার চেষ্টায় অনেকে রকম-বেরকমের দেশ-সেবার আয়োজন করেছেন। কেউবা হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্স নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন, কেউবা তাদের ভাঙ্গা লাউ মাচার বাঁশের খুঁটি জুগিয়ে দিয়ে তাদের মন কেড়ে নেবার চেষ্টায় আছেন, কেউবা ভাগবতের তত্ত্বকথা শুনিয়ে তাদের তাপিত প্রাণ শীতল করবার জোগাড় করছেন। কিন্তু গোড়ার কথার দিকে কেউ বড় একটা ঘেঁষতে চান না। সে গোড়ার কথা শোনাতে গেলে রাজনৈতিক বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে নাকি সামাজিক আর অর্থনৈতিক বিপ্লব সুরু হয়ে যাবে, আর তাতে নাকি ঢাক, ঢাকী, মনসা সবই বিসর্জ্জন হয়ে যাবে! আমাদের

স্বদেশ-সেবকদের রাজনৈতিক বিপ্লবে আপত্তি নেই, কিন্তু সামাজিক আর অর্থনৈতিক বিপ্লব (যাতে তাঁদের নিজেদের পুঁটুলিতে হাত পড়বে) তার নাম শুনলেই তাঁরা আঁতকে ওঠেন।

এই মনস্তত্বই স্বদেশ-সেবার অন্তরায়; এরই ফলে অতীতের যত আন্দোলন সব মাঝপথে ভেঙ্গে পড়েছে; আর এখনও যদি আমাদের আক্কেল না-হয় ত বলতে হবে যে ভবিষ্যতের ব্যর্থতার বীজও ঐখানে নিহিত রয়েছে।

৫ই ভাদ্র, ১৩৩০